৯ম·বর্ষ

উত্তরণ

শারদ সংখ্যা

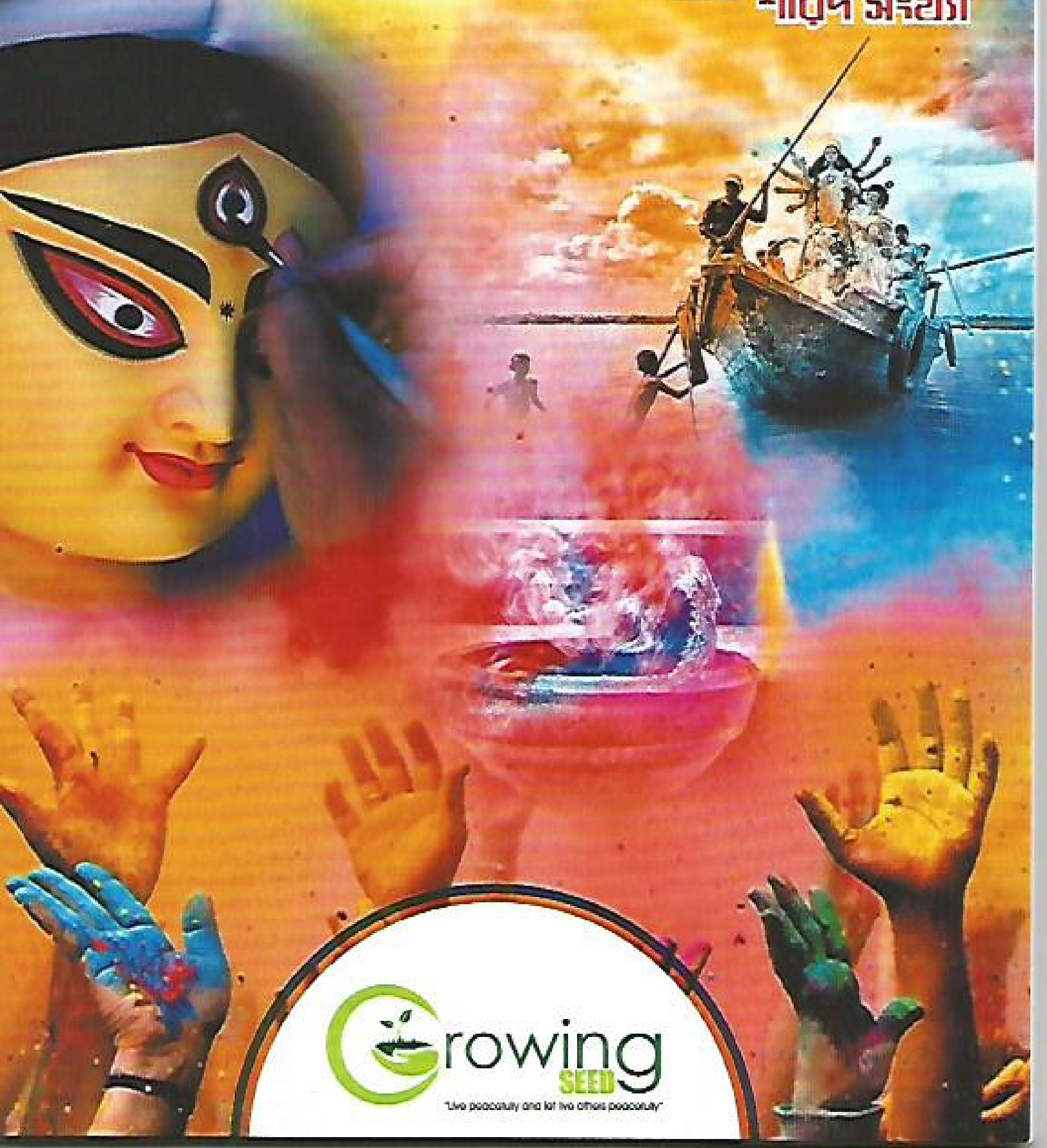

উত্তরন

শারদ সংখ্যা - ২০১৯

Growing Seed, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা
ই-মেল : seedgrowing@gmail.com
ফেসবুক : facebook.com/growingseedinfo
লগঅন করুন : www.growingseed.in
টুইটার : @growingseed1

(বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষের নয়।)

UTTARAN
Edited by : Growing Seed
₹ 20

নবম প্রকাশ :
০৪-১০-২০১৯

প্রকাশ :
Growing Seed Printing Unit
চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, উঃ ত্রিপুরা।

প্রাপ্তিস্থান :
জ্ঞানদা পুঁথিঘর, ধর্মনগর

মুদ্রক :
মহামায়া আর্টস্ এন্ড অফসেট
নেতাজীপাড়া, ধর্মনগর, উঃ ত্রিপুরা।

অক্ষর বিন্যাস :
সুজিত দাস (মো: 8131973237)

প্রচ্ছদ :
অনুপম ভট্টাচার্য্য
Haploids advertising
Vadodara, Gujarat

মূল্য :
২০ টাকা মাত্র

সম্পাদকের কলমে -

সভ্যতা বিকাশের ইঁদুর দৌড়ে ক্রমাগত মনে হচ্ছে আমরা মরীচিকার পেছনে ধাবমান। আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত আমরা প্রাকৃতিক কোন না কোন উপাদানের উপর আঘাত করেই যাচ্ছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমশঃ বিস্তারের ফলে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে বিস্তর। কিন্তু এর ফলে কুপ্রভাবও পড়েছে অনেক। ধরে নেয়া যাক পারমাণবিক বিস্ফোরক কিংবা রাসায়নিক কীটনাশক, এদের আবিষ্কারের পেছনে উদ্দেশ্য মহৎ হলেও বর্তমানে এগুলি ডেকে আনছে অনেক বিপদ। তাই সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি জনস্বার্থে প্রয়োগ করতে হবে।

আরেকটা বিষয়ে আলোকপাত করা যাক, জল আমাদের জীবন বলে পরিচিত কিন্তু আমরা সবাই জানি বর্তমানে আমরা জল সংকটের সম্মুখীন। আমরা নগরায়নের ফলে বড় বড় প্রাসাদসম বাড়ী ঘর তৈরী করছি, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ ভূ-ভাগকে ইট-সিমেন্ট দিয়ে আবৃত করে দিচ্ছি, যার ফলে বৃষ্টির জল ভূগর্ভে যেতে পারছে না। অন্যদিকে বিপুল মাত্রায় ভূগর্ভস্থ জল নিষ্কাশন করা হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ আমাদের ভূ-নিম্নস্থ জল শেষ হয়ে আসছে। তাছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ব্যবহার, জল অপচয় করে পানের যোগ্য জল আমরা শেষ করে ফেলছি।

বর্তমানে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে তা আরোও শতগুণ মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই জলের জন্যই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে। তাই এখন থেকে আমাদের সচেতন হতে হবে। জলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অপচয় কমাতে হবে এবং জল সংরক্ষণের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে– তবেই এই পৃথিবী আমাদের বসবাসযোগ্য থাকবে।

বিনীত- প্রকাশক

Growing Seed

October, 2019

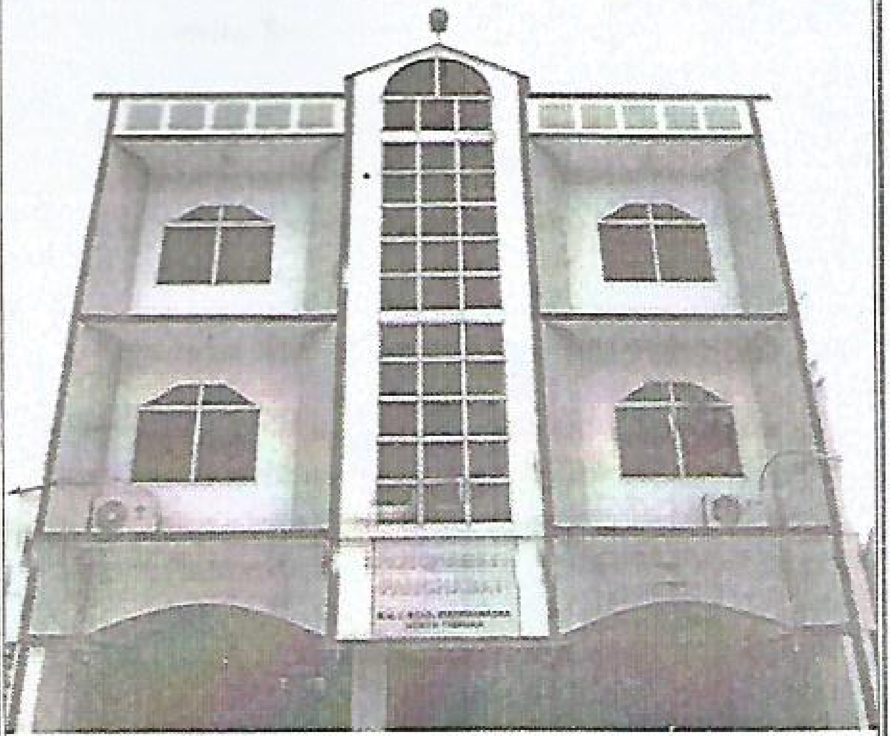

Hotel Panchabati

(03822) 235 121
08730819772

D.N.V. Road, Dharmanagar
North Tripura

Hotel, Restaurant, Conferance Hall

AC-Room, Car Parking facility also available

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

বিষয়	ক্রমাঙ্ক	লেখকের নাম
দাহ	০১	বিধান চন্দ্র দে
নিজেকে গণ্ডার মনে হয়	০৫	সেলিম মুস্তাফা
জাগো নব প্রাণে	০৬	শিউলি শর্মা
বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ণ	০৭	সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য
আজো তোমায় খুঁজি	১০	নির্ঝর পাল
মুক্তির বার্তা	১১	তপা কর
না বলা কথা	১২	সুস্মিতা নাথ (সুমন)
আত্মবিস্মৃতি	১৩	মণিশঙ্কর চক্রবর্তী
আগমনী	১৪	সৌম্যদীপ চক্রবর্তী
ইতিহাসের আলোকে শারদীয়া	১৫	দেবাশীষ দাস
জীবন ও কর্মযজ্ঞ নিয়ে কিছু ভাবনা	১৬	দীপালোক ভট্টাচার্য্য
এক অ্যামাজন	১৭	অনিন্দিতা দেবনাথ
ঘুড়ি	১৭	সুপর্ণা লিলিথ দাস
এক পশলা জীবনানন্দ	১৮	অয়ন মুখার্জি
জীবন ও প্রকৃতি	১৯	লিপিকা দাস
প্রসঙ্গে গায়ত্রী মন্ত্র	২১	পুষ্পা দাস
নীরবতায় আক্রান্ত	২২	শেখর দেব
ভেবে-চিন্তে জর	২৩	সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য
আমার শেষের কবিতা	২৪	প্রসন্ন পাল
মোবাইল ফোনের অপব্যবহারে আক্রান্ত শিশুসমাজ	২৫	স্বপন দে
প্রকৃতি বন্দনা	২৬	আশিষ দেবনাথ
রক্তে লেখা	২৮	সঙ্ঘমিতা নাথ
প্রিয় মন	২৯	দেবজ্যোতি আচার্য্য
পরিচয়	৩০	দেবজ্যোতি দাস
শরৎ উঠল সেজে	৩১	নন্দিতা ভট্টাচার্য্য
অনন্য প্রেম	৩১	সুকান্ত দাস
বিজ্ঞান ও সভ্যতা	৩২	নীহারেন্দু নাথ
জলই জীবন	৩৫	গৌতম ভট্টাচার্য্য

A Flex Printing Unit

Prop.: Biswajit Dam

Ultimate Design

Nayapara Kalibari Road, Oppo. Assam Oil Quater Complex,
Dharmanagar, North Tripura

8787 886 894 / 8974 308 149

dambiswajit@gmail.com

High Defination
COLOUR that makes
a BIG Impression

Best Quality Product with Affordable Price **GUARANTEED**

দাহ

▣ বিধান চন্দ্র দে

দৃশ্যটা প্রথম নজরে পড়ল অনলের।

চোখে পড়ার মত জায়গা নয়। আলো-আঁধারি ঘিরে রেখেছে। দু'ফুটি ড্রেন আর ইউরিনাল পয়েন্টের পাশে এক চিলতে স্থান। হাট বার। শ'য়ে শ'য়ে লোক আসা-যাওয়া করছে। পেছনটা জুড়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের ইয়া বড় অফিস। সেই সন্ধ্যে থেকে লোডসেডিং চলছে। একটু আগেই হাতির বৃংহন শব্দ করে জেনারেটারটা চালু হয়েছে। পূর্ব প্রান্তের সারি সারি দোকান গুলোতে বেসরকারী কানেকশ্‌ন মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে।

আকাশের বুক ভরা কালো মেঘ। মাঝে মাছে বিদ্যুতের ঝলকানি। সাঁঝ-সন্ধ্যে থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঝরছে। এখানে ওখানে পথের খানা-খন্দে জমে পড়েছে জল।

অনল আশির দাঙ্গার দু'বছর পর গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। দাঙ্গার বচর গুলিতে সে পরীক্ষা দিতে পারেনি। অনেক গুলো বছর বেকার যন্ত্রণায় ভুগছে। দল করেনি, কোন দলও তাকে ফিরে দেখেনি। গেল বছর একরকম সেধেই ওয়ার্ড মেম্বার বলেছিলেন– কিরে, কিছু একটা কর। এতগুলো বসন্ত পার করে এসেছিস্ কিছু না করলে, তোর নাম কি করে সুপারিশ করি বল ?

অনল বুঝে ছিল কথাটা। সেই শুনেই খাটছে। আর মাত্র চারটে দিন। তারপরেই লোকসভার ইলেকশান। সারাদিন দৌড়-ঝাঁপ, পথসভা, মিছিল-মিটিং, ফ্লাগ-ফেষ্টুন-পোষ্টার লাগানো। বাড়ি বাড়ি ভোটার স্লিপ পৌঁছে দেওয়ার কাজ প্রায় শেষ লগ্নে এনে ফেলেছে ওরা। এখনও শ'দুয়েক ভোটার স্লিপ অনলের পকেটে পড়ে রয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যে থেকেই মনটা খারাপ। সারাদিনের ধকলের পর অবসন্ন শরীরেই দূরদর্শনের একজিপ পোল দেখতে বসেছিল। তার মনে হল এবারও হ্যাং পার্লামেন্ট হবে, অকাল বোধন বিফলেই যাবে। তাছাড়া পার্টিও সুইটেবল কন্ডিশনে নেই বলেই মনে হল। রাত্রে বুথ অফিসে ওয়ার্ড মেম্বার অভয় দিয়ে বলেছিলেন– ঘাবড়াস নে অনল, ওসব আয়াস করা এন্যালাইসিস, বুঝলি। একদম বোগাস। দেখবি পোল রেজাল্ট এলে আমাদের পার্টি সুইপ করে দেবে। এখন কাজ করে যা। ফলা-ফলে আমরাই দেখে নিস্ জিতবো। কিরে কথা বলছিস না যে ! –না, দাদা ভাববেন না। আমরা সব ঠিক করছি।

সাত সকালে ক্রিং ক্রিং টেলিফোনের রিং শুনে অনলের ঘুম ভাঙলো। ঘুম জড়ানো চোখে রিসিভার তুললো। অপর প্রান্তে রিন্টুর গলা। ওর পাশের বাড়ীর রঞ্জনদা পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর কাজ করেন। উনি সহ আরো সাতজন থালাছড়া থেকে কিড্‌ন্যাপড্ হয়েছেন। আর তুই ছামার কাছে প্রকাশ্য রাস্তায় বৈরী গুলিতে দু'জন ডেড।

খবরটা শুনে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল অনলের। ডায়াল ঘুরিয়েই রিং করলো ওয়ার্ড মেম্বারকে।

হ্যালো, দাদা না কি ? আমি অনল বলছি– খালাছড়ার ইনসিডেন্টটা কি ঠিক ? কোন কর্মসূচী আছে কি ?

ফোনের অপর প্রান্ত নীরব। লাইন কেটে গেল।

বিরক্ত হয়ে অনল রিসিভার নামিয়ে রেখে জানালার পাশে এসে দাড়াল। বাইরে তখন সূর্য্যের হলদে আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে। রাস্তা দিয়ে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ভ্যান গাড়ি যাচ্ছিল। আর বাচ্চারা একসঙ্গে কোরাস গাইছিল– 'উই শেল ওভার কাম, উই শেল ওভার কাম, উই শেল ওভার কাম সাম ডে...

মাত্র আড়াই মাস আগে একটা নির্বাচন হয়ে গেল। পঞ্চায়েতীরাজ। দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে সারা 'হুরুয়া' গ্রামটা চষে ফেলেছিল অনল। কত বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। 'হুরুয়া' নামটিই বুনো, রোমাঞ্চকর। শিলঙের এক বাঙালী লেখক বলেছিলেন এই নামটি 'হর্ষ-চরিত' রচনাকার বাণভট্টের দেওয়া। বাঃ, বেশ আকর্ষণ করে গ্রামটা। জিওল, মান্দার আর বাঁশ বন দিয়ে ঢাকা গ্রাম। পাহাড়ি জংলার ফাঁকে ফাঁকে টিলায় টিলায় বসতি ঘর। শীতের শেষে মান্দারের লাল ফুলে সেজে ওঠে এ স্থান।

গ্রামবাসীর কাছে শোনা গেছে, আগে এখানে প্রায়শই বাঘের উৎপাত হতো। গাছে গাছে ছিল বাঁদর। মাঝে মাছে মিলত সজারু, বনরুই। আরো কত পশু-পাখির কল-কাকলি। এখন সুনশান। রাস্তা ঘাট হয়েছে। পৌঁছে গেছে ইলেকট্রিসিটি। অনেকেরই ঢেউ টিনে ছাওয়া মাটির ঘর। বিদ্যুতের হুক লাইন তার ইতঃস্তত ঝুলছে। আবার কিছু কিছু ঘরের চাল উড়ে গেছে ঝড়ে। হেলে মত। ভাঙা চাল জুড়ে রয়েছে লাউ ডগা আর বরবটি লতা। কোন কোন বাড়িতে দু'একটা মুরগী, হাঁস, ছাগল ছানাও অনল দেখতে পেল। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বাঁশ-বেতের অর্ধনির্মিত দ্রব্যাদি ছড়িয়ে রয়েছে সে দেখেছিল।

অনল শিক্ষিত ছেলে। এক নজরেই অনুমান করেছিল স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে গ্রামের বিকাশের রূপরেখা।

পঞ্চায়েত ভোটেই পরিচয় হয়েছিল অবনী মালাকারের সঙ্গে। ঘরের দাওয়ায় বসে আপন মনে ছোট ছোট লাকড়ির বোঝা বাঁধছিল। অনলদের দেখে আপ্যায়ন করল। একটা দু'এক জায়গা ছিঁড়ে যাওয়া পাটি বিছিয়ে দিয়েছিল।

অনল পরিচয় দিয়ে পার্টির পক্ষে বক্তব্য রাখে। বর্তমান সময়ের গ্রাম বিকাশ, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রাসঙ্গিকতা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এক নাগাড়ে বলে সে থামলো। বেচারা অবনী হা করে এতক্ষণ সব শুনলো।

অনল ভোটার স্লিপ বের করে অবনীকে দেয়। ইত্যবসরে পারিবারিক কিছু তথ্য সে

জেনেও নেয়। অবনী ছোটবেলা থেকেই ওর বাপের সঙ্গে লাকড়ির বোঝা বাজারে নিয়ে বিক্রি করে সংসার প্রতিপালনের দায় কাঁধে নিয়েছিল। এখনও জংলা থেকে খড়ি আহরণ আর বোঝা আকারে তৈরী করে শহরের বাজারে বিক্রি করেই তার সংসার চলছে। এ্যাটলাসের পৃথিবী বহনের মতো। এ জাত ব্যবসার বোঝা বহন অবনীর কাছে অসাধ্য হয়ে আসছে।

শহরের লোকেরা এখন রান্নার গ্যাস, ষ্টোভ ব্যবহার করেন। খড়ি লাকড়ির পানে ফিরেও তাকান না। কয়েকটা ছোট বিস্কুট ফ্যাক্টরী, লোহা-লক্কড়ের ঝালাই দোকান, আর হোটেল মালিকেরা কিছু কিছু লাকড়ি নিচ্ছেন। তাও আবার যাচ্ছেতাই দামে। তাছাড়া সরকারী বন কেটে আনা নিষেধ। লুকিয়ে চুরিয়ে আনতেও হ্যাপা। বিরক্ত হয়ে বড় ছেলেটা কিছুদিন যাবৎ রিক্শা টানছে। এই এক আয়ের বিকল্প পথ। কিন্তু লাকড়ি টানা আর ঠেলা রিক্শা টানা একই। এক ভাবে বাঁচতে পারলেই হলো।

অবনী ছেলের কথায় ঘাড় নেড়ে সেদিন সম্মতি দিয়েছিল– হ্যাঁ রে, টানা বহনই তো আমাদের জীবন। সংসারের ঘানি টানতে টানতে সাঙ্গ হবে একদিন কাঁদা-হাসা।

দুই

সন্ধ্যের ঝির ঝির বৃষ্টি এখনও ঝরছে। সঙ্গে দমকা হাওয়া। সারাদিনের কাজের ধকল সয়ে অনল বাড়ী ফিরছে। এমন সময় একটা পুরোন ডি মডেলের লরি ঢ্যাডাং ঢ্যাডাং শব্দ করে এই দিকেই আসছিল। অনল একেবারে ফুটপাতের ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির হেড লাইটের তীব্র আলোয় তার নজর একটি দৃশ্যের প্রতি আবদ্ধ হল।

একপাশে লাকড়ির বোঝায় ঠেস্ দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আছে একটি লোক। কালো মতন। তার গা গড়িয়ে বৃষ্টির জল ধুয়ে মুছে নামছে। উদোম গা। দেখে মনে হবে একটা ষ্ট্যাচু।

অনল একটু এগিয়ে লোকটাকে দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ দেখে মনে হল লোকটি তার চেনা। স্মৃতি মন্থন করে মনে হল– এ হরুয়া গ্রামের অবনী লাকড়িওয়ালা। দু'পা এগিয়ে অনল ডাক দিল। কোন উত্তর এলো না। এবার সামনে ঝুকে জোরে ডাকল। এবারও নিরুত্তর ! একটু বিরক্ত হয়ে অনল চলেই যাচ্ছিল। আবার কি মনে করে অবনীর নগ্ন কাঁধে আলতো করে ঠেলা দিতেই চমকে উঠল। চরাচরের যত শীতলতা যেন গ্রাস করেছে এ দেহ। যে উত্তাপ সে বহন করে এনেছে মানুষের তরে আজীবন, তা বিকিরণ করে করে আজ হিম শীতল।

মুহুর্তে লোক জড় হয়ে গেল অনলের ডাকাডাকিতে। পথচারী অনেকেই ছাতা উচিয়ে জটলার কারণ জানতে চাইলেন। অনেকে মারা গেছে একজন লোক শুনেই সটান কেটে পড়লেন।

দমকা হাওয়া। কালো ঘুটঘুটে রাত। হাজারো ঝামেলা মিটতে বারটা বাজলো, পুলিশ এলো। এক্সিডেন্ট ইনসিডেন্ট শুনে এলো দমকল। তবে হসপিট্যালে পোষ্টমর্টেমটা হয়ে গিয়েছিল চট্ জলদি। কিছু না হার্ট এ্যাটাক ! অবশেষে ডেড বডি পৌঁছল শ্মশানতলা। জুরি নদীর পাড়।

এই ফাঁকে অনল ওয়ার্ড মেম্বারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল। ওনার খাস সেক্রেটারি এসে খবর দিয়ে গেলেন - স্যার আসতে পারবেন না। শ্মশান তলার পার্টিকর্মীদের নিয়েই যাতে দাহকার্য্য সমাধা করে নেয় অনল।

গভীর রাত।

ঝির ঝিরে বৃষ্টি।

শ্মশান তলার খালিক, ভূপতি, হরিশ, ঠাকুর ভাইয়েরা মিলে কিছু বাঁশ-ছন আর একটা পুরোন ছেঁড়া টায়ার চাকা যোগাড় করে দিয়েছিল মৃত দেহ সৎকারের জন্যে, মদ খেয়ে বোঁদ হয়ে থাকা যাদু আর ওমপ্রকাশ শ্মশান সাজাতে লাগল অবনীর বহন করে আনা লাকড়ির বোঝা দিয়ে। অবনীর ছেলেটা বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে রিকশা নিয়ে সোজা শ্মশানে চলে এল। সে শ্মশানের মাটিতে পড়ে ডুকরে কাঁদছে।

কর্কশ বাজখাই গলায় 'হরিধ্বনি' দিয়ে দাহকার্য্য শুরু হল। দাউ দাউ করে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে একটা মৃতদেহ। লাল আগুনের লেলিহান শিখায় অনলকে ততধিক লাল দেখাচ্ছে। মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে অনল দেখতে পেল, একটা মৃত দেহ নয়। লাল আগুনের বুকে দগ্ধ হচ্ছে আস্ত একটা পৃথিবী। যে পৃথিবীর চোখে মহা রিক্ততা, শূন্যতা। আবর্তনের গতি রুদ্ধ। স্থবির পৃথিবী।

জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, লাকড়িওয়ালা অবনী আজ দাহ হচ্ছে তারই বাহিত লাকড়িতে। আর অনল, এখনো জীবিকার কোন পথই খুঁজে পায়নি।

কেমন এক অব্যক্ত জ্বালায় তার বুক দহে মুখ দিয়ে বেড়িয়ে আসছিল মহাশ্মশানের উদ্গীড়িত আগুন। সে পাগলের মত পকেট হাতড়ে বুক পকেটে রাখা ভোটার স্লিপ গুলো বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল আগুনে। তারপর টলতে টলতে নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চললো।

একটা ভোরের পাখি অনলের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে করুণ মিষ্টি সুরে অন্ধকারের অবসানের জন্যে ডাক দিয়ে গেল।

* * * *

নিজেকে গণ্ডার মনে হয়

▣ সেলিম মুস্তাফা

একদিন টের পেলাম আমার কোনো জ্ঞান নেই
কেবল জঞ্জাল
কোনো প্রতিবাদ নেই, ঘরে
বিভিন্ন পেরেকে সাজানো অজস্র টুপি
কোনোটা গোল তো কোনোটা চৌকোণা
টুপি ছাড়া আমি বেরোতে পারি না
হৃদয়ের আকার কেমন জানা নেই বলে
ওখানে কোনো টুপি পরি না

রক্ত দান করার পর
ওরা আমার হাতে একটা আপেল দিয়ে বলল–
এটা অমূল্য, এটা মহৎ,
কখনো চিবিয়ে খেয়ো না !

ফ্লাইং কিস্ দিল ঠোঁটের কোনো ক্ষতি হয় না
আপেল চুষতে চুষতে আমার ঠোঁট এত মোটা হয়েছে যে
নিজেকে গণ্ডার মনে হয়
শহরে অনেকেই আমাকে ক্লোন করেছে
প্রকৃতপক্ষে আমার কোনো ভাই নেই বোন নেই

আরও গভীর জঙ্গলে আমি যেতে চাই

জাগো নব প্রাণে

▣ শিউলি শর্মা

তোমারি কিরণবাগে
চোখ খুলে সূর্যমুখী
কামনা বাসনা –
কোথা থেকে আসে ওরা মেঘ জল,
শিশিরের কণা।

সন্ধ্যার গোধূলিরাগে
দিগন্তের পার হতে আসে
অনন্তের বাণী, শেষ নাই জানি
তবু তুচ্ছ ক্ষুদ্র জলবিন্দু মিলায়–
সাগরে, মহাকাল স্পর্শে হয় সোনা,
ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে, দুর্বল মেরুদন্ড হতে
কি করে বুঝি বল তোমার মহিমা।

ছয়ঋতু কোথা হতে পায় সব
অপরূপ রূপ, কখনো ময়ূরাক্ষী
কখনো ধ্বংসের স্তুপ।
ফুলের গন্ধ, শ্রাবণের টলটলে জল
ঋতুভেঙ্গে ভরপুর মহুয়া মাদল,
খোলো তব দ্বার, বায়ুহীন মহাকাশে
দেখি, কি কথা, কি আনন্দ,
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছায়াপথ পারে
কে আমায় ডাকে,
আমি তারে শুনি বনের পথে
ঝিঁ ঝিঁর মর্মভেদী তানে,
মধ্যরাতে, শব্দহীন, মৃত্যুহীন প্রাণের বোধনে,
বাজাও বাজাও তুমি
সুপ্তি থেকে তোলো টেনে বীণা,
ধ্বংস স্তুপ সংশ্লেষে
জাগাও নব প্রাণের গরিমা।

বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ণ।

▣ সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য

শিক্ষা মানুষের মানসিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। উন্নত দেশ ও জাতি গঠনের মূল মানদন্ড শিক্ষা। দেশ ও সমাজের সূচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্বাধীনোত্তর ভারতে সময়ের তাগিদে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এবং তাদের প্রস্তাবিত সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৪৮ এ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন, তারপর ১৯৫২-৫৩ সালে ড. লক্ষণস্বামী মোদালিয়র এবং ১৯৬৪ সালে ডি.এস. কোঠারির নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশন গুলি ভারতীয় শিক্ষার মান উন্নয়ণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

শিক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৯২ সালে কিছুটা সংশোধন হয় এবং ২০০5 সালে পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে আসে ২০০৯ এর শিক্ষার অধিকার আইন। প্রত্যেক কমিশন, কমিটির কিছুটা দুর্বলতা ঘাটতি থাকলেও সামগ্রিক ভাবে সময়ের নিরিখে শিক্ষা ব্যবস্থায় এগুলি এক একটি মাইলস্টোন। সম্প্রতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কস্তুরিরঙ্গনের নেতৃত্বে তৈরি নতুন কমিটি শিক্ষা বিষয়ক 'খসড়া নীতি ২০১৯' পেশ করেছেন। এই নতুন খসড়া নীতিতে ভারতীয় বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষার গুণগত ও কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। ২০১৯ শিক্ষানীতির (খসড়া) সামগ্রিক পর্যালোচনায় বিদ্যালয় শিক্ষার উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনা গুলি নিম্নরূপ :-

১। বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে একটি স্ব-বিরোধী ধারণা ছিল সহ-পাঠ্যক্রম বা Co-curriculum যদিও Curriculum বলতে শুধু সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী বোঝায় না, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিদ্যালয় থেকে একটি শিশু যে সমস্ত পরিকল্পিত অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে তার সমষ্টিই পাঠ্যক্রম। সমস্ত অভিজ্ঞতা শিশুর কাছে পৌঁছাতে হলে বিষয় ভিত্তিক সিলেবাসের বাইরে জীবন কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আর সেই সূত্রেই নাচ, গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা ইত্যাদিকে বলা হয়েছে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী। অনেক ক্ষেত্রেই 'সহ' বা 'Co' শব্দ জুড়ে দিয়ে এই সমস্ত বিষয়ের সামগ্রিক মূল্যায়ন হত না, ফলে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ বা 'All round development of a child' শুধুমাত্র বাক্য হিসাবেই ব্যবহার্য ছিল। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য, ভারতীয়

খসড়া শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে (৪.১ নং অনুচ্ছেদে)

"There should be no extra curriculum on Co-Curricular activities, all such activities must be considered curriculum."

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী পাঠ্যক্রমের অধীনে আসলে শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ণ তরান্বিত হবে - আশা করা যায়।

২। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ১০+২ ব্যবস্থার পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪ স্তরের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ প্রাক্-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক গ্রেড-১, গ্রেড-২ (বর্তমান ক্লাস-১, ক্লাস-২) পর্যন্ত ৫ বছর হবে প্রি-প্রাইমারি। পরের তিন বছর গ্রেড-৩, গ্রেড-৪, গ্রেড-৫ মিলে প্রস্তুতি পর্ব বা Latter Primary স্তর। প্রিপারেটরি স্তরের পর গ্রেড-৬, গ্রেড-৭, গ্রেড-৮ মিলে উচ্চ প্রাথমিক পর্যায় এবং বিদ্যালয় পর্বের শেষ স্তর গ্রেড-৯ থেকে ১২ পর্যন্ত সেকেন্ডারী পর্যায়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাক্-প্রাথমিক থেকে শুরু করলে ১৩ বছরের বিদ্যালয় জীবন, খসড়া নীতিতে শিশুর ৩ বছর বয়স থেকে শুরু হবে অর্থাৎ ১৫ বছরের বিদ্যালয় জীবন। দ্রুত এগিয়ে যাওয়া সভ্যতার সঙ্গে আগামী দিনের মানব সম্পদ তৈরি করার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। যান্ত্রিক যুগের শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ দ্রুত হচ্ছে, তাই তিন বছর বয়স থেকে বিদ্যালয়ের সাথে পরিচিত হলে উন্নয়ন ফলপ্রসু হবে। যদিও বেসরকারি স্তরে তিন বছর বয়স থেকেই নার্সারী স্তর শুরু হয়, তবুও সামগ্রিক ভাবে সর্বক্ষেত্রে চালু হলে গুণগত শিক্ষার ক্ষেত্রে মাইল ফলক হবে।

৩। শিক্ষার্থীর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে ২০১৯ এর খসড়া নীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ভাষা এবং গণিতের মৌলিক দক্ষতার বিকাশ সাধনে। গবেষকদের অভিমত, ভাষা এবং গাণিতিক স্তরের উন্নয়ন দ্রুত হলে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান সহজ হয়। খসড়া নীতিতে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এই পর্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'Early Childhood Care and Education' (ECCE)। প্রাক্-প্রাথমিক ভিত্তি দৃঢ় করার জন্য 'ভাষা মেলা' এবং 'গণিত মেলার' কথা বলা হয়েছে। এবং আপাতত পরিবর্তিত খসড়া অনুযায়ী ভিত্তি স্তর থেকেই ত্রি-ভাষা সূত্র ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, কারণ এই বয়সেই শিশুর মস্তিষ্কের সর্বাধিক বিকাশ হয়।

৪। খসড়া প্রস্তাবে বর্তমানে মিড-ডে-মিলের সঙ্গে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের উপযুক্ত প্রাত:রাশের কথা বলা হয়েছে। খুব সদর্থক ভাবনা, কেননা আমাদের দেশে পৃথিবীর মোট পুষ্টিহীনদের ৫০ শতাংশ বসবাস করে। কিন্তু মিড-ডে-মিল খাতে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং তৃণমূল স্তর পর্যন্ত তার পুষ্টিমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ তদারকির প্রয়োজন আছে। সামগ্রিক মিড-

ডে-মিল কর্মসূচীকে পরিবর্তন করে সেকেন্ডারী স্তর পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু করলে আরো ভালো হত, কেননা আমাদের দেশের অনেক কিশোর-কিশোরী অপুষ্টির শিকার।

৫। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার কারিগর শিক্ষক সমাজ। উপযুক্ত গুণমান সম্পন্ন, উৎসাহী, কর্মপ্রাণ শিক্ষকের দ্বারাই বাস্তবায়িত হতে পারে শিক্ষার মূল কর্মযজ্ঞ। সমগ্র দেশের সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমানে ১০ লক্ষ শিক্ষক পদ শূন্য। আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতিও আশাব্যঞ্জক নয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যদিও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে - তবুও তা সাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহজলভ্য হলে ভালো হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণে বেসরকারী উদ্যোগ কমাতে খসড়া কমিটি সুপারিশ করেছে। অনেক সাধারণ শিক্ষার্থী শিক্ষক হিসাবে নিজেকে তৈরি করতে নিবেদিত প্রাণ, কিন্তু পরিস্থিতির প্রতিকূলতা অতিক্রম করার সামর্থ্য তার নেই। নতুন শিক্ষানীতির দায়ভার নিতে হবে শিক্ষক সমাজকেই। আজকের 'Dynamic' শিক্ষক জাতি আগামী দিনের 'Advance Human Resource' তৈরি করবে।

৬। খসড়া শিক্ষানীতি ২০১৯ এ কিছু কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বয়স অনুযায়ী তাদের শিক্ষাগত মানের সূচক হয় ক্লাস বা শ্রেণি দিয়ে। এর পরিবর্তে গ্রেড ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নাম পরিবর্তন করে 'শিক্ষামন্ত্রক' রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং সবার উপরে থাকবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ'। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা উপকরণের ঘাটতি মেটানোর জন্য কয়েকটি স্কুলকে একত্র করে 'স্কুল কমপ্লেক্স' বা একটি বিদ্যালয়ে রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে। উপজাতি অধ্যুষিত দুর্গম অঞ্চলে 'এলাকা নির্ভর বিদ্যালয় একত্রীকরণ' সমস্যার সৃষ্টি করবে বলে একাংশ অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। এ বিষয়ে সূক্ষ্ম চিন্তাধারার প্রয়োজন আছে।

পরিবর্তনশীল সময় ও সমাজের চাহিদা মেটাতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ (খসরা) শিক্ষার্থীর জীবনের নব দিগন্তের উন্মোচন করবে। ভারতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতির প্রসার ও বিকাশ সাধন ঘটবে, বিজ্ঞানাশ্রয়ী শিক্ষা চিন্তার বিস্তার হবে যাতে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের নির্মাণ করতে পারবে– কস্তুরিরঙ্গনের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিটির সুপারিশের যথাযোগ্য বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগের দ্বারা দেশের শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গঠন তথা যথার্থ মানব সম্পদ তৈরি হবে– বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এটাই আশা এবং ভরসা।

আজো তোমায় খুঁজি

(কবি জীবনানন্দ দাশকে উৎসর্গীকৃত)

▣ নির্ঝর পাল

ঋতুচক্রে তখন ফাল্গুন মাস।
মধুঋতুর আবাহনে প্রকৃতি তখন উত্তাল।
জীবলোকের এই মধু আনন্দের ক্ষণে তোমার
জৈবিক পদচারণা শুরু,
তাই তুমি-ই হয়ে উঠলে জীবনানন্দ।

প্রকৃতির প্রতিটি বৃক্ষলতা, বাংলার নদনদী
তোমার দৃষ্টির স্নিগ্ধ আনন্দে হলো মায়াময়।
হৃদয়-সমুদ্রের অতল-গভীরে নিমজ্জমান তুমি
সাদা বকের পাখায় লাগালে কাকাতুয়া রোদ।
আবার হাজারো বছরের পথ হাঁটার পরেও তুমি
আজো অক্লান্ত।
'শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয়'-এর প্রত্যাশী ছিলে তুমি।
কিন্তু হায় কবি ! তুমি কী চেয়েছিলে এই ছবি।
তোমার 'রূপসী বাংলা' আজ মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিংয়ের প্রকোপে
তার রূপ হারিয়েছে। 'সাতটি তারার তিমির' আজ এক অদ্ভুত
আঁধারে বিলীন। 'সুচেতনা' আজ সত্যিই এক দূরতর দ্বীপে
নির্বাসিতা। আজ এই ফাল্গুনের গভীর আঁধারে লাশকাটা
ঘরে শুয়ে আর কোনোদিনো না জাগার জন্য সে চির নিদ্রিতা।
রূপসার ঘোলাজলে ডিঙা বাওয়া কিশোর আজো তার
স্বপ্নতরী বেয়ে যায় কোনো এক অজানার উদ্দেশ্যে।
যে কিশোরী মুথাঘাস মাড়িয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে
যেত আগামীতে, আজ সে সমাজের নীল বিষে নিওন
আলোর নীচে আলোর অভিসারিকা।
'অর্ধনারীশ্বর' রূপে তুমি 'রূপসী বাংলা'র হৃদয়-গভীরে
আছো কি না জানি না, কিন্তু অর্ধনারীশ্বরেরা আজো
বাসে ট্রেনে রাস্তায় করুণা ভিক্ষা করে।

কবি, একদিন তো তুমিই জানিয়েছিলে ভালোবাসার রং গোলাপের রক্তের মতো লাল। তাই আমরা ভালোবাসার দিনে রক্তহোলীতে মাতি। ফলে এই মহাপৃথিবীর' বুকে এক 'বিপন্ন বিস্ময়' 'আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে।'

আজ যখন জীবন পথের বেলা পেরিয়ে অবেলা এবং কালবেলার মাঝে আমরা দিকশুন্যপুরের পথিক, তখন হে জীবন পথিক জীবনানন্দ ফিরে এসো– ফিরিয়ে দাও শুধু একবার ফিরে এসো। শুধু একবার এই ঘুণধরা সমাজের শীর্ষে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলো :-

"এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা সত্য,
তবু শেষ সত্য নয়,
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই
অনন্ত সূর্যোদয়।"

মুক্তির বার্তা

▣ তপা কর

সেদিন এর এক লহমায়
শুনেছিলাম নদীর কিনারায় কিনারায়
শুনেছিলাম বালির প্রতি কণায় কণায়
এসেছিলো এক প্রভাত পাখীর বার্তা,
মুক্ত দ্বারের পথ যেন আজ খোলা।
বলছে পাখি তার ডানার হাওয়ায়
মুক্ত পথের পথিক শোন ও-রে ভাই,
নিয়ে যাও মোরে ঐ মুক্ত পথের ধারে
মুক্ত পথের ঐ নিদারুণ হাওয়ায়
জুড়িয়েছে অনেক প্রাণের জ্বালা
জুগিয়েছে নিত্য নতুন মনের আশা
শোন ও-রে ভাই,
নিয়ে যাও মোরে ঐ পথের তরে।

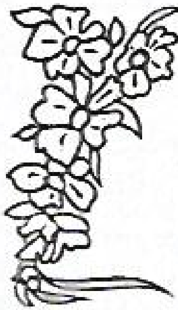

না বলা কথা

▣ সুস্মিতা নাথ (সুমন)

একাকিত্ব জড়িয়ে থাকে আষ্টেপৃষ্ঠে,
শত কোলাহলে, গভীর নির্জনতায় বাতাস
আলিঙ্গন করে থাকে যেভাবে।।

কত কথা যা নিজেকেও বলা হয় নি আজও,
বলা হয়নি সেই অনুভূতির কথা– যা সৃষ্টি
করেছিল মনে আলোড়ন বা নীরব ঝড়।

কতবার নিজেকে পাখি হয়ে খোলা আকাশে
উড়তে দেখেছি, সমুদ্রের ঢেউ হয়ে আছড়ে
পড়েছি।

ঝড়না হয়ে পাহাড় বেয়ে নেমেছি।
বিন্দু বিন্দু জল হয়ে ভিজিয়েছি মরুভূমি।

শিশির বিন্দু হয়ে নরম ঘাসে খেয়েছে লুটোপুটি।।

শরতের কাশফুল, গ্রীষ্মের চন্দ্র মল্লিকা,
রজনীগন্ধার গন্ধ হয়েছি, হয়েছি হেমন্তের
শীতলতা।।

খোলা মাঠে মুক্ত বিহঙ্গের মতো এক প্রান্ত থেকে
আরেক প্রান্তে গিয়ে মিশে গেছি।

রাতের অন্ধকারে জোনাকি হয়ে মিটমিট করেছি।।

জীবনের প্রথম সূর্য উদয়ের অনুভূতি কি বলা হবে
না শেষ সূর্যাস্তের আগে ???

আত্মবিস্মৃতি

▣ মণিশঙ্কর চক্রবর্তী

জীবনকে ভালবাসতে শিখেছিলাম
আজ আর এই মন্ত্র মনে নেই
ঝড় বাদলের দিনে নিজেকেই নিজের কাছে
পেয়েছিলাম
তাই বোধহয় নিজের প্রেমে পড়েছিলাম
বুকে আজ সেই প্রেম আর বেঁচে নেই।

আজ ভালবাসা স্নেহ, প্রেম বিমুখ হয়েছে
শুধু মনের কোণে তার পায়ের ছাপ রয়েছে
এ ঘৃণা নয় যা ভালবাসার স্থান নিয়েছে
এ বিষন্নতা যা আজ আসন জুড়েছে

এখন গাঙের জোয়ার করেনা আমাকে ব্যাকুল
কালো মেঘ-সাদা বক করে না আমায় অস্থির
ভেজা ঘাসে পা ফেললেও, বাঁধিনা নতুন গান
পুরনো বন্ধুর নাম শুনেও হয়না উচাটন

যেনো কিছুই আজ নেই বেঁচে, যা ছিল বাঁচার
কারণ
তবুও কি খোঁজে মন, অবিরল সারাক্ষণ
হয়তো দিগন্তে নতুন ঊষার কিরণ
কিংবা, নিরবে মুছে যাবার কোনো উপকরণ।

আগমনী

▣ সৌম্যদীপ চক্রবর্তী

আগমনীর সুর ভাসছে আকাশে,
মায়ের আসার ঘন্টা বাজছে বাতাসে,
বছর ঘুরে এল আরেক আশ্বিন,
দুর্গা পুজোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত
উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ।।

বর্ষা শেষে নীল-আকাশ আনন্দ জাগায় মনে,
মন আজ হারিয়ে যায় শিউলি ফুলের গন্ধে,
নদীর পাশে কাশ ফুলেরা হাওয়ায় যখন দোলে,
মা দুর্গার আগমনের অপেক্ষায় মন প্রস্ফুটিত হয়ে
উঠে।।

শরতের আকাশে রোদের ঝিলিক,
মা আসছেন ঘরে-ঘরে,
বাজছে ঢাক, বাজছে কাসর
মন আজ প্রানবন্ত ধুনোচি নাচের আসরে।।

বছর ঘুরে এল আবার খুশির শরত,
মহালয়ার পূণ্য সকালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের শোনা,
উৎসব উচ্ছ্বাসে কাটবে এ চার দিন,
সবাইকে জানাই শারদীয়ার শুভেচ্ছা।।

ইতিহাসের আলোকে শারদীয়া

▣ দেবাশীষ দাস

বৃষ্টি ভেজা শরৎ আকাশ,
শিউলি ফুলের গন্ধ
মা আসছেন আবার ঘরে, দরজা কেন বন্ধ ?

প্রাক্‌কথন :- বারো মাসে তেরো পার্বন কথাটি হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রচলিত থাকলেও, শারদীয়া বা দূর্গা পূজাই বেশী আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে পালিত হয়।

দেবী দূর্গা হলেন শক্তির রূপ, তিনি পরব্রহ্ম। অন্যান্য দেব-দেবী মানুষের মঙ্গলার্থে তার বিভিন্ন রূপের প্রকাশ মাত্র। দেবী দূর্গা "দূর্গতি নাশিনী"।

সূত্রপাত :- ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতায় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতীর মধ্যে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় (হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা) দেবীমাতা, ত্রিমস্তক, দেবতা, পশুপতি শিবের পূজার প্রচলন ছিল।

তবে কৃত্তিবাসের রামায়নে আছে, শ্রীরামচন্দ্র কালিদহ সাগর (বগুড়ার) থেকে ১০১টি নীল পদ্ম নীল সংগ্রহ করে সাগর কূলে বসে বসন্তকালে সীতা উদ্ধারের জন্য সর্বপ্রথম শক্তি তথা দূর্গোৎসবের আয়োজন করেছিলেন।

আবার, মারকেন্দ্রীয় পুরাণ মতে, চেদী রাজবংশের রাজা সুরথ খ্রীষ্টের জন্মের ৩০০ বছর আগে কলিঙ্গে দূর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন।

মধ্যযুগ ও বাংলা :- মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দূর্গাপূজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১১শ শতকের 'অভিনির্ণয়'-এ, মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির 'দূর্গাভক্তি তরঙ্গিনীতে' - দূর্গা বন্দনা পাওয়া যায়। বঙ্গে ১৪শ শতকে দূর্গাপূজার প্রচলন ছিল কিনা তা জানা যায় না। ১৫১০ খ্রীঃ কুচ বংশের রাজা বিশ্বসিংহ কুচবিহারে দূর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। ১৬১০ সালে কলকাতার বরিশার রায় চৌধুরী পরিবার প্রথম দূর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ১৭৯০ সালের দিকে এই পূজার আমেজে আকৃষ্ট হয়ে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার গুপ্তি পাড়াতে বারোজন বন্ধু মিলে চাঁদা তুলে প্রথম সার্বজনীন ভাবে আয়োজন করে বড়ো আকারে দূর্গাপূজা, যা 'বারোইয়ার' - 'বারোইয়ারি' বা বারনুর পূজা নামে পরিচিতি পায়।

আধুনিক সময় :- আধুনিক দূর্গাপূজার প্রথম ধাপ ১৮ শতকে নানান বাদ্যযন্ত্র

প্রয়োগে ব্যক্তিগত ভাবে, জমিদার বা রাজপরিবারে ও ব্যবসায়ী মহলে প্রচলন ঘটে। পাটনা শহরে, ১৮০৯ সালে দুর্গাপূজার ওয়াটার কালার ডকুমেন্ট ছবি পাওয়া যায়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেবী দুর্গা স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে জাগ্রত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পূজা বারোয়ারী বা কমিউনিটি পূজা হিসেবে জনপ্রিয়তা পায়। আর স্বাধীনোত্তর কালে এই পূজা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান উৎসবের মর্যাদা পায়।

উপসংহার :- এভাবেই সময়ের বিবর্তনে রূপ পরিবর্তন হতে হতে বর্তমান সময়ের রং বাহারী পুজোর আত্মপ্রকাশ। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, যেখানেই বাঙালী জাতিসত্তার অস্তিত্ব সেখানেই পূজিত হোন "মা"। রং বাহারী আলো, পোষাকের বিজ্ঞাপন আর নিজেদের প্রেজেন্টেবল করতে গিয়ে সময় বিশেষে হয়তো আমরা হারিয়ে যাই মূল স্রোত থেকে। তাই, সবশেষে অসুরনাশিনী আমাদের সবার আসুরিক প্রবৃত্তি দমন করে জাগিয়ে তুলেন মহাভাব, হেসে উঠুক বিশ্বমানবতা, এই কামনা জগৎ জননীর চরণে। ভালো কাটুক শারদীয়া।

জীবন ও কর্মযজ্ঞ নিয়ে কিছু ভাবনা

▣ দীপালোক ভট্টাচার্য্য

কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ আমাদের জীবন। ব্যস্ততার মাঝেও জীবন খুঁজে নিতে চায় একটু আনন্দ। আনন্দপূর্ণ মূহুর্ত স্মরণের মাধ্যমে আমাদের জীবন খুঁজে পায় তার প্রাণশক্তি। কাজকর্ম, অফিস, ব্যবসা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সকলকে নিয়েই বেঁচে থাকার নামই জীবন। আর্থিক উপার্জনের আশায় প্রত্যেকে ব্যস্ত নিজ নিজ পরিবারের মুখে অন্ন যোগাতে। আধুনিকতার স্পর্শে আনন্দপূর্ণ মূহূর্তগুলি যেমন মাপছাড়া হয়ে যায় আজকের এই ডিজিটাল যুগে সকলই ব্যস্ত আধুনিকতায়। সময়ের অভাবে কমে যাচ্ছে শিশু-কিশোর-তরুণ-তরুণীদের খেলাধূলা, ভ্রমণ। মানুষ তার নিত্যদিনের কাজকর্মের ফলে হারিয়ে ফেলছে তার আনন্দপূর্ণ মূহুর্তগুলো। তবুও আমরা সকলে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকি ব্যস্ততার মাঝেও চাওয়া-পাওয়া সবকিছুকে নিয়ে এগিয়ে যেতে। ব্যস্ততা, কর্মজীবন তো থাকবেই তবুও সবাই মিলে আনন্দপূর্ণ মূহুর্তগুলো সঙ্গে করে নিয়ে জীবন উপভোগ করার নামই বেঁচে থাকা।

এক অ্যামাজন

▣ অনিন্দিতা দেবনাথ

আমি আড়াল চেয়েছিলাম চার কিনারে।

তুমি আর কতটুকু জানো ?
প্রতিদিন অভিশাপ সঞ্চিত রেখেছি,
আর তুমি ?
তুমি চেনা শহর থেকে
উঁচু নিচু সবুজের ঢলকে হত্যা করেছো;
আর মাঝে মাঝে নত হয়ে বলেছো–
"গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও" ।

লোকে তো জানে না কিছুই,
জানুক না, টেনে নিক পাপ !
আমি কিন্তু এভাবেই হামাগুড়ি দিয়ে বিলুপ্ত হবো।

তোমরা সবাই খুব পরিমিত স্বাভাবিক কথা বলো,
কিছুই ঘটেনি যেন,
সত্যিই কিছু ঘটেনি !
শুধু পুড়ে ছাই হয়েছে
কয়েক লক্ষ সবুজ আর লোহিত রক্তকণিকা।

ঘুড়ি

▣ সুপর্ণা লিলিথ দাস

যেতে বলছো ? চলেই গেলাম
চিঠি পেয়েছি আসমানী নীল খামে,
উড়তে পাব বকের সাথে,
সমান্তরাল হয়ে,
আকাশ তখন সাজ পরবে
দুধে আলতা রঙে, বাধা ছেড়ে,
লাটাই ছেড়ে, উদাস উড়ে যাব
মাঞ্জা তো আর লাগায়নিকো কেউ !
সুতো আমার আবার কাটা পড়ে।
পেছন ফিরে দেখি আমি, দুটো
হাপুস নয়ন ডাকে, ফিরে আয়, ফিরে আয়
সবুজ ধানের জমিন ডাকে
ফিরে আয়, ফিরে আয়, দেব
তেপান্তর আর নেই, শুকতারারও
আলো গেছে নিভে
প্রজাপতির রঙটা গেছে চুরি,
ফুলের গন্ধ, ফলের গন্ধ মেকি,
তার চেয়ে তো উড়েই বেড়াই ভালো,
এবার কি নাম দেবে ? "সুতো কাটা ঘুড়ি !"

এক পশলা জীবনানন্দ

▣ অয়ন মুখার্জি

একদিন সব ছেড়ে চলে যাবো
টুপ্‌ করে ঝরে পড়া হিমের মতো।
পড়ে রবে তেলকুপি দেউলের বৈকালির দুপুর,
পড়ে রবে ভৈরবী বাউলের একতারা সুর,
ঝরাপাতার মতো শুয়ে থাকবে কালবৈশাখী
বিকেল।

চলে যাবো অজানা দ্রাঘিমাংশের দ্বীপে।
অত্রি নক্ষত্রের নিভু আলো যেথা চুমে বালুরাশি,
চাঁচরের বাঁকা চাঁদ জেগে রয় তটে।
সেইখানে রব আমি জেগে।

একদিন সব ছেড়ে চলে যাবো
বাংলার ধুলোমাখা মেঠো পথ ধরে।
দেখিবে না মোরে আর আশ্বিনের শিউলির
ভোরে;
পাবেনাকো আমারে যে মধুক্ষরা কীর্তনের দলে
বিষন্ন মাঘকুয়াশার সাঁঝে আর নেবোনাকো
আগুনের ওম।

চলে যাবো ছায়াপথের গোলকধাঁধায়
কালপুরুষের তরবারি লয়ে হাতে।
জীবনের কলরব যবে পরশিবে দ্বারে,
সেইক্ষণে খুঁজে পাবে মোরে।

তারপর অযুত আলোকবর্ষ দিয়ে পাড়ি
আবার ফিরিব আমি এক মহালয়া ভোরে।
আবার বাঁধিব গান গোড়াইয়ের কবির দলে,
খেঁজুরছড়ি ধানকাটা মাঠে গেঁয়ো যাত্রাপালায়,
আবার দেখিবে মোরে বাঁকাদহের মেলায়।
শ্যাম বাংলার চড়ুই আর বাবুইয়ের নীড়ে
আবার আসিব আমি ফিরে।

ঃ জীবন ও প্রকৃতি ঃ

▣ লিপিকা দাস

হঠাৎ যখন একফোটা জল এসে আমার কপালটাকে স্পর্শ করল, মনে হলো যেনো কার চোখের জল আমার কপালে এসে টিপ পরিয়ে দিল। সেই অনুভূতি আমি আজও উপলব্ধি করতে পারি। আমি ধীরে ধীরে চোখ খোলে দেখলাম তখনো সন্ধ্যা হয়নি। সেই বিশাল বটগাছটা আমাকে যেনো কোলে করে ঘুম পাড়াচ্ছিল। আর গাছের পাতাগুলি যেনো হেলেদুলে আমাকে অবিরাম বাতাস করছে ব্যস্ত ভাবে। হঠাৎ সেই একফোটা জল যখন হাজার বাঁধা অতিক্রম করে আমার কপালে এসে পড়ল তখন আমার ঘুম ভাঙ্গল। ভালো ভাবে এপাশ ওপাশে তাকিয়ে দেখলাম সন্ধ্যা হতে আর বেশী বাকি নেই। পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা সেই বিশাল বটগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে উঁকি মারছে। পাখির দল সারি বেঁধে নিজ নিজ বাসস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম যে দিনের শেষে পাখিরাও নিজের বাসস্থানে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়। রাখাল বালকেরা যে এই পথ দিয়ে গরুর পাল নিয়ে গেছে সেই ধূলো এখনো আমার নাক মুখ দিয়ে ঢুকছে।

আকাশ মেঘলা, দু-একফোটা বৃষ্টির জল ইতিমধ্যে যেনো মাটিতে পড়ছে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই যেনো সমস্ত নীল আকাশটা সাদা মেঘে ঢেকে গেছে। মনে হচ্ছে কারা যেনো গাড়ী গাড়ী তুলো এনে আকাশের কাছে বন্ধক রেখে গেছে। ধীরে ধীরে আমার চারপাশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। এবার রীতিমতো আমার ভয় হতে লাগল। তবে কী আজই আমার জীবনের শেষদিন, তবে কী আর কালকের সূর্য দেখা হলো না, এখন যদি একবার মা বা বাবাকে দেখতে পেতাম, আর কত কী মনে হতে লাগলো। কেন যে দুপুরবেলা পরিশ্রান্ত হয়ে এই বটের তলায় বিশ্রাম নিতে বসেছিলাম, তখন কী আর ভেবেছিলাম যে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব।

ঝিঁ ঝিঁ পোকা যেনো সন্ধ্যা হতেই তার নিয়মিত গলা ছেড়ে রেওয়াজ করতে শুরু করে দিয়েছে। মনের মধ্যে শুধু একটাই প্রশ্ন বিষণভাবে ঘুরপাক করছে, জীবনে কী আরেকটা সুযোগ পাওয়ার আশা আছে ? ঘন ঘন মেঘ যেনো গর্জন দিয়ে উঠছে আর বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ঘন বৃষ্টি নামতে আর বেশী সময় বাকী নেই। বাতাসের তালে তালে গাছের ডালপালা গুলিও যেনো নৃত্য করে চলেছে আপন তালে।

হঠাৎ আমার মনে হলো কিছু একটা আমার বা হাতের উপর দিয়ে চলাচল

করছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ-এর আলোয় দেখতে পেলাম লাল পিঁপড়ের দল বৃষ্টির ভয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। আমি যেন তাদের সেই পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছি। পিঁপড়ের এই সারিবদ্ধভাবে চলাচল আমাকে বরাবরই অবাক করত। এবার অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন ওদের সেই লম্বা সারি শেষ হবে, আর এদিক ওদিক ভালো ভাবে দেখতে লাগলাম।

মনে হলো সেই দূরে যেনো দুটি পাশাপাশি আলো জ্বলতে দেখলাম। আর দেরী করা উচিত হবে না ভেবেই দুপায়ের উপর শরীরের ওজন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার ব্যাগ কোথায় ? পাশেই তো রেখেছিলাম বিশ্রাম নেবার সময়। অন্ধকারে ভালো ভাবে দেখাও যাচ্ছে না। বিদ্যুতের বাতির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। এদিকে ঠান্ডা হাওয়ার তীব্রতাও যেনো ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। মনে হচ্ছে যেনো হিমালয়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি আর আমার চারপাশে বরফের আবরণ। হাত পা গুলি যেনো অবশ হয়ে আসছে। বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেলাম ব্যাগটা পাশেই একটা গর্তের উপর পড়ে আছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে ব্যাগটা আনতে গিয়ে দেখি ব্যাগের নীচে দুটি বিড়ালছানা বাইরের পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে ব্যাগের নীচে নিরাপদে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের এই ভাড়া নেওয়া নিরাপদের আশ্রয় নষ্ট করে দিতে মন কিছুতেই সায় দিল না, তাই ব্যাগটা রেখেই সেই পাশাপাশি দুটি আলোর উদ্দেশ্যে পা এগোতে লাগলাম। প্রতিবার পদক্ষেপ ফেলার সময় বেশ বুঝতে পারছি যে পরের পদক্ষেপ ফেলার জন্য পা দুটি যেনো তৈরি হতে চাইছে না। এদিকে প্রকৃতি যেনো আমাকে তার তান্ডব দেখাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

অনেক কষ্ট করে এগিয়ে যখন সেই আলোর কিছুটা পাশাপাশি পৌছলাম তখন নিজেকে নিজে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার সামনে বাঘটি দুচোখ বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বাঘটির চোখের মনি দুটি যেনো উজ্জ্বল হয়ে আমাকে আরো স্পষ্ট করে সামনের বিপদকে দেখিয়ে দিচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি নিজেকে নিজে সামলাতে পারি নি। তারপর নিজেকে বাঁচতে দুপায়ের মধ্যে কে যেনো শক্তির যোগান দিয়ে দিল। দু-পা পেছনের দিকে নিয়ে বাকী ক' পা যে সামনের দিকে ফেলেছি তা গুনার সময় হয়নি। এমন কী ডান না বা দিকে যাচ্ছি তাও ঠার করতে পারি নি। বৃষ্টিও যেনো আমার সাথে সাথে চুর পুলিশ খেলার মতো পিছু নিয়েছে। মুষলধারে বৃষ্টি।

হঠাৎ কী একটা জিনিসের মধ্যে পা লেগে উল্টে গিয়ে পড়লাম। কোথায় পড়লাম, কীসের মধ্যে পা লেগে পড়লাম, বৃষ্টিই বা কখন থামল, কিছুই মনে নেই।

যখন চোখ খুললাম দেখতে পেলাম মা আমার মাথায় ভেজা কাপড় বুলিয়ে দিচ্ছেন। সমস্ত শরীরে ব্যথা, জ্বরটা একটু কমেছে, ডাক্তারবাবু ঔষধ দিয়ে গেছেন।

"কে আমাকে বাড়ীতে নিয়ে এলো ?" এই প্রশ্ন মাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হয় নি, তাই এই প্রশ্নের উত্তর আমার আজও অজানা। কিন্তু যে উত্তরগুলি ঐদিন জেনেছিলাম তা আমার জীবনে অনেক বড় পাওনা। প্রতিটি জীবই বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে পারে। ঐদিন থেকে বিনা কারণে একটি পিঁপড়েকেও মারতে আমার মনে ব্যথা লাগে। প্রতিটি জীবই নিজের জীবনকে অনেক ভালোবাসে।

প্রসঙ্গে গায়ত্রী মন্ত্র

■ পুষ্পা দাস

"ওঁ ভূর্ভুবস্ব তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ"

গায়ত্রী মন্ত্র সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশী জানি। তবু কোথাও না কোথাও ভারতবর্ষের মহান মহান সৃষ্টি আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

গায়ত্রী মন্ত্র বৈদিক হিন্দু ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। এটি ঋগ্বেদের একটি সুক্ত। গায়ত্রী মন্ত্র গায়ত্রী ছন্দে রচিত। মন্ত্রটির শুরুতে ওঁ কার এবং মহাব্যাহৃতি নামে পরিচিত "ভূর্ভুবঃ স্বঃ শব্দবন্ধটি পাওয়া যায়। এই শব্দবন্ধটি তিনটি শব্দের সমষ্টি - ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ। এই তিনটি শব্দ দ্বারা তিন জগতকে বোঝায়। ভূঃ বলতে মর্ত্যলোক, ভূবঃ বলতে আকাশলোক এবং স্বঃ হল স্বর্গ ও আকাশের সংযোগ রক্ষাকারী স্বর্গলোক বোঝায়। এই তিনলোক চেতন, অর্ধচেতন ও অচেতন - এই তিন স্তরের প্রতীক।

সংস্কৃত শব্দ 'মন্ত্র' এর জন্ম হয়েছে 'মন' এবং 'ত্রা' শব্দ দুটি থেকে। মন হল আমাদের শক্তির উৎসস্থল। আর ত্রা শব্দের অর্থ হল পদ্ধতি। অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে মনকে আনন্দে রাখা যায়, তাই হল মন্ত্র। ঋকবেদে উল্লেখ রয়েছে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করলে আমাদের সব ক্ষত, তা মনের হোক, শরীরের হোক কী মস্তিষ্কের সব ধরনের যন্ত্রণার উপসম ঘটে। সর্বপরি এই মন্ত্র আমাদের আশেপাশের সমস্ত নেগেটিভ এনার্জিকে শেষ করে শরীরকে পজেটিভ এনার্জিতে পরিপূর্ণ করে তোলে।

নীরবতায় আক্রান্ত

▣ শেখর দেব

সেটা ছিল সেকেলের কথা, ভাবতেও অবাক লাগে, যা আজ এত পরিবর্তন।

শান্তিপুর গ্রামে এক কৃষক তাঁর দুই ছেলে ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাস করত। কৃষক তাঁর কৃষিকাজ করেই তার ছেলেকে মানুষ করল, অর্থাৎ এখানে মানুষ বলতে পড়াশুনায় শিক্ষিত করে তুলল। কৃষক ছিল খুবই সৎ যা আজ অন্য কাউকে ঠকিয়ে অর্থাৎ বোকা বানিয়ে এক টাকাও নড়চড় করতেন না। উনার স্ত্রী শহরে এসে অর্থে (টাকায়) সজ্জিত বড় লোকের ঘরের কাজকে স্বল্পতার উদ্দেশ্যে অর্থ রোজগার করত। গ্রাম থেকে শহরে আবার শহর থেকে গ্রাম ..... হাঁটতো কয়েক দশক মাইল ... যার জন্য তাঁরা একটু স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাতে পারে।

এমন করেই চলতে লাগল ১৫ (পনেরো)টি বছর যার অনুভব ছিল সূর্যের প্রখরতায় মরীচিকায় আক্রান্ত একটি মানব শরীর।

তারপর ধীরে ধীরে কৃষক ও তাঁর স্ত্রী বৃদ্ধাবস্থায় লিপ্ত হতে থাকে, বড় হতে থাকল তাদের ছেলেরা.... চলে গেল শহরে পড়াশুনা করতে, বড় মানুষ হতে... কুড়ে ঘরকে আঁকড়ে ধরে রয়ে গেল শুধু কৃষক ও তাঁর স্ত্রী আর রয়ে গেল ছেলেদের স্মৃতি।

আজ ঠিক আছে.... পরবর্তী সময় হয়ত ছেলেরা তাদের মা-বাবাকে দেখতে আসবে অথবা তাদেরকে ছেলেদের আনন্দের বিলাস মহলে নিয়ে যাবে....।

সেটা কি সত্যিই সম্ভব হয়েছিল ! সম্ভব তো দূরে থাক কৃষকের লেখা একটি চিঠিরও উত্তর দেবার সময়টুকু হয়ে উঠেনি... কারণ তারা সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর লোক... তাঁরা এত ব্যস্ত ছিল যে মা-বাবার সাথে দেখা করা, উনাদের ভালোমন্দ খবর নেওয়ার সময়টুকু নেই।

এতে করে ৮ (আট)টি বছর পার হয়ে গেল ছেলে তার মা-বাবার খবর পর্যন্ত নেয়ই নি। তারপর তারা একদিন মারা গেল।

এই খবরটুকু শুনে বলল আপদ বিদেয় হলো।

এই আমাদের শিক্ষিত সমাজ... যে সমাজ... কুকুরকে এমনভাবে পোষ মানায়... যে কুকুরকে কোন সময় কোন কাপড় পরাতে হবে, স্নান করাতে হবে এবং কী কী খাওয়াতে হবে তারও একটি মেনু চার্ট থাকে। কারণ কী জানেন ... কারণ শিক্ষিত সমাজের বাড়িতে কুকুরের লালন পালনের মূল্যায়নে তাদেরকে মূল্যায়িত করা হয়।

একটি পশু হাসপাতালে কুকুরকে নিয়ে যে ভাবে বাবা-রে সোনা-রে বলে ডাক দেওয়া হয় বা বাবা-সোনা বলে ঔষধ খাওয়ানো হয়... তার চরিত্র মনে হয় নিজের আসল মা-বাবার উপর প্রকাশ পায় না।

যা হল আমাদের শিক্ষিত সমাজ।।

যা আজ নিষ্প্রাণ নিস্তব্ধতায় পাথরে চাপা পড়ে আছে।

ভেবে-চিন্তে জল

▣ সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য

জলের মতো খুব সোজা–
তবু এতো সোজা নয়,
একটু ভেবে জল খরচে পরের জীবন সুখের হয়।

যারা ভাবছেন আজকেই তো জীবন–
"কাল কিসনে দ্যাখা",
তবুও দেখি ভাই সকল ব্যাংকে ঠিক জমাচ্ছেন
ট্যাকা।

নিজের বাচ্চার ভবিষ্যৎ চিন্তায়–
কি মগ্ন কাকু-কাকী,
সন্তানের সুখের জন্য ধন আগলে রাখছেন
রাশি-রাশি।

সম্পদের কথা ভাবছেন যে শুধু,
টাকা ফেললেই কি সব হয় ?
খাবার জল যে এদিকে ফুরিয়ে যাচ্ছে–
তা কিন্তু সত্যি ভাববার বিষয়।

পৃথিবীর ফুসফুস জ্বলছে,
উষ্ণতা বাড়ছে দিন-দিন ;
সোশাল মিডিয়া ছাড়া বাস্তব জীবনে সকলে
চিন্তাহীন।

অন্যের হয়েছে তা হোক–
আমার তাতে কি !
বলছি দাদা নিশ্চয়ই সমাজের কেউ নন আপনি ?

সংরক্ষণের কথা বললেই খুঁড়ি বলেন–
"উফ্ এসব বইয়ের কথা অসম্ভব বাস্তবে !"
আরে দাদি মনে নেই ?
অবাস্তব স্বাধীনতাকেও একদিন কেমন
এনেছিলাম ঠিক।

ভাবতে গেলে এমন বেশি কিছু নয়,
আগামী প্রজন্মের নিমিত্তে একটু হিসাবী খরচে–
জল সম্পদ আমাদের যাতে অক্ষুন্ন রয়।

আমার শেষের তুমি

▣ প্রসন্ন পাল

কবির কল্পনা নও,
আজ তুমি কঠোর বাস্তব।

আমার হৃদয়বহ্নির ইন্ধন তুমি
আমার নিরাকার হৃদয়ের বন্ধন তুমি।
হৃদয় হয়েছে ভস্মীভূত,
আবেগের বিন্দু আজ সমুদ্র।
তবুও তোমার হৃদয়কে ছুঁতে পারিনি আজও
তোমার প্রেম তোমার হৃদয়েই রুদ্ধ।
আমার না বলা কথাগুলো বলা হয়ে গেছে
প্রতীক্ষাও হয়েছে শেষ।
নিজের আবেগে নিজেই ভিজেছি
পাইনি তোমার রেশ।

বৃষ্টিভেজা বিকালের রামধনু নও
পথভ্রষ্ট পথিকের মরীচিকা তুমি।
আমার আবেগ তোমার কাছে অভিনয়
আমার ভালোবাসা শুধুই ন্যাকামি।

আমি চেয়েছি তোমায় বাঁধতে,
তুমি কেড়েছ আমার শক্তি।
আমার ছিল প্রেম,
তোমার ছিল যুক্তি।
কর্ণভূমিতে আজ আমি সূতপুত্র
ইন্দ্রের চেয়েও কঠোর তুমি।
কবচ-কুন্ডল নয়,
রুদ্ধ করেছ আবেগ, চেয়েছ হৃদয়ের মুক্তি।

এক অসম্ভবের অভিযানে,
নেমেছি আমি।
শতরূপে প্রেরণা,
অন্য কেউ নয়, এখনও তুমি।

মোবাইল ফোনের অপব্যবহারে আক্রান্ত শিশুসমাজ

▣ স্বপন দে

সমগ্র বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে বিজ্ঞানের অনন্য সব দানগুলি। একসময়ে যা কল্পনার অতীত ছিল তাও আজ সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যোগাযোগ বৃহত্তর হয়েছে। আবিষ্কার হয়েছে মোবাইল ফোন। যা মানবজাতির কল্যান সাধনের অনন্য দান হিসাবে কাজ করছে। বর্তমান যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হল মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন আজ শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ সকলেই ব্যবহার করছেন। মোবাইল ফোন ইন্টারনেট পরিসেবা চালু হবার পর মোবাইল ফোনের ব্যবহার রাতারাতি বদলে গেছে। শিশুদের কাছেও এটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অথচ এটি ব্যবহারের কারণে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে শিশুরা, তা আমাদের সচেতন সমাজ ভুলে যাচ্ছে।

গবেষণা বলছে মোবাইল ফোন ব্যবহারে শিশুদের মানসিক বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, পাশাপাশি রয়েছে ক্যান্সারের ঝুঁকি। অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের ফলে একাকীত্ব থেকে একসময় শিশুদের অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা যায়। মূলত: গেমস বা নানা ধরনের ভিডিও দেখার কারণে মোবাইল ফোন ব্যবহারের আগ্রহ শিশুদের দিন দিন বাড়ছে। শিশুদের আবদার মেটাতে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে মোবাইল ফোন। জেনে রাখা দরকার, শিশুরা এক মিনিট মোবাইলে কথা বললে মস্তিষ্কে যে কম্পন তৈরী হয় তা স্থির হতে সময় লাগে দুই ঘন্টা। তা মস্তিষ্কের বিরাট ক্ষতিসাধন করছে।

অনেক সময় দেখা যায়, একটি ছোট শিশু যখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারছে, তখন মা-বাবা স্বভাবতই প্রথম অবস্থায় খুশি হন। তাদের এই খুশির প্রকাশ শিশুর কাছে মোবাইল ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ হিসাবে কাজ করে, যা শিশুকে আরোও উৎসাহিত করে মোবাইল ব্যবহারে। বর্তমানে প্রায়ই দেখা যায় শিশুদের খাওয়া, ঘুম প্রতিটি কাজ করানো হয় মোবাইলে গেম বা ভিডিও চালিয়ে। এমনকি শিশুর হাতে মোবাইল তুলে দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করছেন মায়েরা। তাতে মায়েদের কাজ সহজ হয়ে গেলেও এটি শিশুদের নেশায় পরিণত হয়ে যায়। এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায়, যখন শিশুটি অন্যদের সাথে মিশতে চায় না, চুপচাপ থাকে, মস্তিষ্কের সাধারণ বিকাশের বাধাপ্রাপ্ত হয়। শিশুদের মনোযোগ কমে যায়। বয়স্কদের থেকে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, মস্তিষ্কের কোশও নরম। তাই মোবাইল ফোন থেকে বিকিরণ হওয়া রেডিয়েশনে

তড়িৎ চুম্বকীয় দূষণের কারণে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হচ্ছে শিশুরা। বলা যেতে পারে, শিশুদের কাছে মোবাইল ফোন সিগারেটের থেকেও বেশী ক্ষতিকর।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে, শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে অবশ্যই শিশুদের মোবাইল ফোনের অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহার কমাতে হবে। পরিবার, সমাজকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। শিশুদের প্রকৃতির সাথে পরিচিতি করাতে হবে। খেলাধূলার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশ ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে মা-বাবা পরিবার পরিজনদের। তবেই সুস্থ স্বাভাবিকভাবে শিশুর পূর্ণ মানসিকতার বিকাশ ঘটবে।

প্রকৃতি বন্দনা

▣ আশিষ দেবনাথ

আকাশটা শান্ত, তারাদলের ঝিলিমিলি ও আলোকপ্রভা অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে প্রস্ফুটিত অসংখ্য জীবন্ত জোনাকির জানান দেয়। প্রকৃতিদেহী যেন নিজ হাতের তুলি দিয়ে চিত্ররূপময় করে তুলেছে। আকাশে-বাতাসে রেখে যাওয়া চিত্রগুলো কাল প্রভাতে থাকবে না, হারিয়ে যাবে এক অমোঘ অন্ধকারে। সুখ হোক কিংবা দুঃখ নতুন প্রভাতে আকাশ এক নতুন তুলি নিয়ে হাজির হবে। হোক সে আকাশের চিত্ররূপ কিংবা মানুষরূপী ঈশ্বরের প্রিয় দূতের জীবনরূপ।

দিনটা ছিল রবিবার। সেদিন পূবের আকাশে সূর্যদেবের প্রভাতী কিরণ বিচ্ছুরিত হয়নি। আকাশে-বাতাসে প্রভাতের সুমিষ্ট, সুমধুর সমীরণের আভাস পাওয়া যায় নি। এঁকিনপুরের গ্রামের চিত্রটা সেদিন এক ধ্বংসাত্মক লীলাখেলার আভাস দিচ্ছিল। ছোট্ট হারান মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে বলল– "মা.... ও .... মা... আজ আকাশটা কেমন জানি কালো হয়ে গেল, বাতাসটা কেমন বিষাক্ত লাগছে।" মায়ের বুকে জড়িয়ে ধরে হারান যেন এক পরমশান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করল।

বলতে বলতে ক্ষণিকের মধ্যে ঝড় ও বাদলের প্রবল ধ্বংসাত্মক ছায়া এঁকিনপুরের মাঠ, ঘাট, ঘর, বাড়ি ইত্যাদিকে গ্রাস করে নিয়েছে। ধ্বংসাত্মক প্রবল ছায়া এঁকিনপুরের লোকারণ্যকে গ্রাস করে নিয়েছে, শুধুমাত্র হারানও তার বাবা পূবের পাহাড়ী ঝোপে জীবনকে আঁকড়ে ধরেছে। প্রকৃতি দেবীর এই নিষ্ঠুর রূপের কবলে হারানের মা তুলসীবেদী ও কালীমন্দিরের বটবৃক্ষের আকর্ষণে ভূ-মাতার সান্নিধ্যে হারিয়ে যায়। মা-হারা হারান স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, একদিন জীবনের রূপ এও হতে পারে।

সপ্তাহ অতিক্রান্ত হলে এঁকিনপুর পুরনো আকাশ নতুনভাবে দেখতে পেলেও গ্রামের চিত্র হারানের চোখে এখনো বন্যার প্রবল ঢেউ-এর রূপ আঁছড়ে পড়ছে। মায়ের প্রকৃতিবন্দনার অন্তরালে হারান প্রকৃতিপ্রেম অনুভব করলেও মায়ের কোলের ছোঁয়া সে হারিয়ে ফেলেছে।

পাঁচ বছর পরের কথা, হারান এখন বছর দশেকের। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। মায়ের স্নেহ-মায়া শূন্য জীবনে হারান তার মা-কে তার কল্পনার জগতে বাঁচিয়ে রাখে সদাসর্বদা। সকাল-সন্ধ্যায় তুলসী বেদী এবং দুপুরে বটবৃক্ষের প্রতি মায়ের এক অনন্য বন্দনা যেন হারানের মনকেও আন্দোলিত করে তুলেছে। ছোট্ট হারান কখন যে তার মায়ের মতো প্রকৃতি বন্দনায় প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছে তা বোঝা যাচ্ছিল না। বিদ্যালয়ের শেষে হারান দুপুরবেলায় গ্রামের বটবৃক্ষের ছায়ায় সময় কাটাত। সেখানে হারান যেন তার মাতৃপ্রেম অনুভব করে। একদিন সে উপলব্ধি করতে পারে যে এই বটবৃক্ষের ছায়ায় আমি যেমন 'সুখ, আনন্দ এবং অমৃতের সম্ভার অনুভব করি, ঠিক তেমনি এই পশুপাখি দলও তা অনুভব করে। তার হৃদয়রাজ্য থেকে বাণী আসে যে বৃক্ষ তথা সবুজ বনানীর মাহাত্ম্য আসলে কতটা ?

ঐ দিনের পর থেকে হারান এঁকিনপুরের রূপসৌন্দর্যকে এক অনন্য রূপদানে ব্রতী হয়। পাহাড়ের রঙ-বেরঙের লতা ও গুল্ম জাতীয় ফুলের সুশোভিত রূপকে গ্রামের আনাচে কানাচে ভরিয়ে দিতে এক উদ্যোমে তার নিসঙ্গী যাত্রা শুরু করে। জীবনানন্দ ও বিভূতিভূষণের কল্পনার ছোট্ট যুবক অর্থাৎ হারান আজ প্রকৃতি প্রেমের বন্দনায় এঁকিনপুরের গ্রামকে নানান রঙের ফুলের সমাহারে স্বর্গরাজ্যের আসনে রূপ দিতে সচেষ্ট ভাবধারার প্রমান দিয়েছে। যা তার প্রকৃতি প্রেমের মত্ততার পরিচয় দান করে। সে এক পরমতৃপ্তি ভোগ করে সুশোভিত ফুলের শোভা, বটছায়া, আমবাগান ইত্যাদির ছত্রছায়ায়। এখন হারান আগের মতো মনমরা হয়ে বসে থাকে না, জীবনের আস্বাদ গ্রহণে সে আজ পরিপক্ক। আজ সে বুঝতে পারে মায়ের তুলসী বেদীর বন্দনার মাহাত্ম্য, সে বুঝতে পারে বটবৃক্ষের প্রতি মায়ের ভক্তি শ্রদ্ধার নৈসর্গিক ভাবনা।

কিছুদিন পর হারান নিশীথ রাতে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। স্বপ্নের ঘোরে সে তার মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গ্রামের পথ ধরে সেই ধ্বংসলীলার সাক্ষী তথা বটবৃক্ষ তলে হাজির। "মা".... "মা" বলে তার চিৎকার ও আর্তনাদ গ্রামের নিশীথ আকাশে বাতাসে হঠাৎ শোকের বার্তা নিয়ে আসল এবং "মা....মা" চিৎকার সে পূবের পাহাড়ের দিকে ছুটতে ছুটতেই তার আর্তনাদও পাহাড়ের বুকে হারিয়ে গেল।

রক্তে লেখা

▣ সঞ্চয়িতা নাথ

চিতার আগুনে জ্বলছে পিচ
গিলছে কত রাজপথ –
পথের গহ্বরে ঝরছে ঘাম
কত পুরুষ মহিলা নর-নারী,
তোমরা কি চেনো তাদের....
শুনেছো কি রক্ত ঝরা ঘাসের কান্না–
দেখেছো কি গলিত পিচের উত্তপ্ত শ্বাসে
ঝলসানো শরীরের কালো ছোপ ?

ক্ষুধার্ত শ্রমিকের করুন ইতিহাসে
ছোট বড় কত জনপথ, রাজপথ
ডানা মেলে জেগে ওঠে এক নুতন সাজে,
পাহাড় টিলা বনভূমির গা ঘেসে আর
নদীর ধার ধরে ছুটে চলে কত মাইল.... কত ক্রোশ,
কত শ্রমিক বন্ধুর উষ্ণ নিঃশ্বাসে
সে পথে ঘুরছে গাড়ির চাকা–
সাইকেল, মটর, মালবাহী লরী,
মারুতি ভ্যান আরও কত প্রাইভেট কার,
শ্রমিক ভাইদের রক্ত ঝরা ঘাম
দুপায়ে মাড়িয়ে সে পথে রাতদিন
ছুটছে কত হাজার জনতা।

শুনেছো কি কখনো সেই কান্নার বিলাপ...
পথের বুকে মিশে থাকা নামহীন
শ্রমজীবিদের নীরব করুণ আর্তনাদ ?
তোমরা কি চেনো তাদের....
শুনেছো কি সেই অশ্রুর ব্যথা.... ?
যে পথ গড়ে তারা– একদিন
সে পথেই লুটায় প্রাণ....

প্রিয় মন

▣ দেবজ্যোতি আচার্য

রোজ চাষ করো তুমি দুঃখ অনুভূতি

তোমার আদ্রতা যে সকালে কমে... সেখানেই
নিকোটিন রঙে আকা কাগজের ওজন বাড়ে
প্রতিমূহুর্তে

হাওয়ায় মিশে যায় তোমার জন্য লেখা সব
কবিতা

প্রিয় মন
রোজ চাষ করো তুমি দুঃখ অনুভূতি

ওয়ালেট-এ খুঁজো পুরোনো স্মৃতির অস্তিত্বটা
বসন্তের দুফোটা মাখবার অপেক্ষায় আছো তুমি
তুমি স্তব্ধ তুমি শীতল তুমি কোনো উদ্দেশ্যহীন
মিছিলে

তুমি পেরাসুট হয়ে উড়ো কবির আকাশে

প্রিয় মন
রোজ চাষ করো তুমি দুঃখ অনুভূতি

তুমি বালিশ বক্ষে স্বপ্নের মতন
বাস্তবে আসলেই সব কর্পূর
তোমার প্রিয় গানের নাম ভুলে যাও প্রতিদিন
তুমি স্থির তুমি অস্থির তুমি নিঃস্ব
তুমি নীল তুমি লাল তুমি কালো তুমি সাদা
তুমি প্রত্যেকটা অনুভূতির এপিটাফ

প্রিয় মন
রোজ করে চাষ করো তুমি দুঃখ অনুভূতি।

পরিচয়

দেবজ্যোতি দাস

শেষ রাতে শ্রেয়া অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরেছে।
সকালের ঘুম ভাঙতেই বাবার রাগি চেহারা
সামনে,
"এখনো এতো বড় হয়ওনি যে মাঝরাত করে তুমি
ফিরবে বাড়ি,
মেয়ে হয়েছো, মেয়ের মতো থাকবে।
কিসের এতো কাজ তোমার ভারি ?
তোমার মাইনের টাকা এই সংসারে লাগবে না,
ওসব করো স্বামীর ঘরে।
আমার ঘরে মাঝরাত করে ঘর ফেরা মেয়ে
থাকবে না।"
শ্রেয়ার চোখ গড়িয়ে জল, মনে দূর্বলতা ও
অভিমান একসাথে যেন।
BScতে First Class, MBA-তে Gold Medalist
আরো কতো কি,
এসব নিয়ে তাহলে বাবার এতো লোক দেখানো
কেন ?
তাহলে কেন ছোটবেলায় বড় হওয়ার স্বপ্ন ধরানো হাতে ?
হতাম কোন হরিপদ কেরানি, মন্দ কি ছিল তাতে ?
মানুষ, সমাজ আর শর্মা Uncle কি বলবে তার ভয় ?
তাহলে মেয়ে কেন বাবা, একটি তোতা পাখি
পাললেই তো হয় ?
বাবা জানো, মেয়ে হয়ে কাজে যেতে খুব সাহস
ধরতে হয়।
হাজারো চোখ ছিঁড়ে খায় বুক,
হাজারো মুখ ও সহ্য করতে হয়।
দিন ঘনিয়ে আকাশ নিভে যখন ঘড়ি ঘরে ডাকে
তোমার মেয়ের ফেরার পথে কতো দানব দাঁড়িয়ে
থাকে।
কতো লালসা পেরোই রোজ, কতো আগুনের হই ছাই,
চোপ হয়ে থাকি রোজ সব বোঝে
তোমার সম্মানটা দামি তাই।
যদি কোন দিন তোমার মেয়ের বোঝ এই ঋণ তবে
পিতা আর স্বামীর বাইরেও এক নারীর পরিচয় হবে।

শরৎ উঠল সেজে

▣ নন্দিতা ভট্টাচার্য্য

কুঞ্জ বীথির পুঞ্জে পুঞ্জে,
অলিরা এসে জোটে
খবর পেতেই মৌটুসীরা
দল বেঁধে ছুটে
ছোট্ট শিশু সাজি হাতে
দৌড়ে ছুটে এল
শিউলী, জুই সব কিছুই
সাজি ভরে নিল
দূর্বা তুলে দু'হাত ভরে
মুখে মিষ্টি হাসি
পুজোর ঘরে উঠে বেজে
শঙ্খ-ঘন্টা-কাঁসি।

অনন্য প্রেম

▣ সুকান্ত দাস

প্রেম মানে নয় শুধু মনের মিলন,
প্রেম মানে হয় আবার একে অন্যের প্রয়োজন।
প্রেম মানে নয় শুধু ভালোবাসি এই কথাটি বলা,
প্রেম মানে হয় আবার দুইজন একসাথে সারাজীবন পথ চলা।
প্রেম মানে নয় শুধু কল্পনায় বেঁচে থাকা,
প্রেম মানে হয় আবার বাস্তবতায় পা রাখা,
প্রেম মানে নয় মুধু মতের অমিল,
প্রেম মানে হয় আবার ভালো-মন্দের মিল।
প্রেম মানে নয় শুধু সত্য মিথ্যা যাচাই,
প্রেম মানে হয় আবার অনেক ভালো আচার।
প্রেম মানে নয় শুধু অন্ধকারে রাত জাগা,
প্রেম মানে হয় আবার ভোরে মধুর হাওয়া লাগা,
প্রেম মানে নয় শুধু অপেক্ষায় দিন গোনা।
প্রেম মানে হয় আবার নতুন নতুন স্বপ্ন বোনা,
প্রেম মানে নয় শুধু বিয়ের মধ্যে সমাপ্তি,
প্রেম মানে হয় আবার শপথ করা দুইজন একসাথে–
হব অন্তিম যাত্রী।

বিজ্ঞান ও সভ্যতা

▣ নীহারেন্দু নাথ

১৯৪৫ সালে বিধ্বংসী পরমানু বোমার আঘাতে যখন ধ্বংস হল হিরোসিমা এবং নাগাসাকি শহর তখন লক্ষ মানুষের আর্তনাদ শোনে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন, "এই বিধ্বংসী হত্যাকান্ডের জন্য আমিই দায়ী, এর সব দায়ভার আমার, আমার আবিস্কৃত সূত্রটি যুদ্ধে ব্যবহৃত হোক এ কখনও আমি চাইনি, আমি যদি পুনর্জন্ম গ্রহণ করি, তাহলে আর বিজ্ঞানচর্চা নয়, এবার হব রাজমিস্ত্রি নয়ত ছুতোর।" পরমানু শক্তির স্রষ্টা মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এই অনুসুচনা বাক্যটি আজ আমাদের, সকল বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীর এমনকি রাষ্ট্রনায়কদের ভাবতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে বিজ্ঞান ধ্বংসের জন্য নয়, শান্তির জন্য বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের মূলচরিত্র হল পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ এবং তার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রকৃতির নিয়ম ও সত্যকে জানার অদম্য জিজ্ঞাসা থেকেই বিজ্ঞান ভাবনার জন্ম হয়। বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষনা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরিক্ষার দ্বারা সত্যকে উদ্ঘাটন করেন। কিন্তু আবিস্কৃত সত্য বা সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ বিজ্ঞানীদের হাতে থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রশক্তি এবং মুনাফালোভী বানিজ্যিক সংস্থার হাতে এর প্রয়োগ বা ব্যবহারের দায়িত্ব থাকে। তাৎক্ষণিক লাভ ও লোভের বশবর্তী হয়ে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োগ যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে তার উদাহরণ বলে শেষ করা যাবে না।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানবসভ্যতার উত্থান ও পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন যুগে লিবিয়া, মিশর, মেসোপটেমিয়া, পারস্য ইত্যাদি অঞ্চলে গ্রীক, রোমান ও সুমেরিয়ানদের সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞানের হাত ধরে। কিন্তু তাদের ধ্বংসের একটি অন্যতম কারণ ছিল বিজ্ঞানের অপব্যবহার। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে উন্নত সমরাস্ত্র ব্যবহার করে পরস্পরের প্রাকৃতিক সম্পদের চূড়ান্ত বিনাশ ঘটায়। ফলত: তাদের সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যায়। যুদ্ধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। বরং মানুষ যুগে যুগে তার আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসা দিয়ে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করে গেছে। কিন্তু এই সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা যতটা ধর্ম এবং রাজনৈতিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ততটা বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ফলে মানুষে মানুষে ধর্মবিরোধ এবং রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ তৈরী হয়। সঙ্গত কারণেই মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত

হয়ে পড়ে। নিজেরাই ধ্বংস করে নিজেদের তৈরী সভ্যতা।

বর্তমান যুগে ন্যানো টেকনোলজি, জিন ট্রান্সফরমেশন, কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইত্যাদি তথ্যপ্রযুক্তির অভিনব উন্নয়ন হলেও অজ্ঞতা কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস অধিকাংশ মানুষের অবচেতন মন থেকে নির্মূল হয়নি বরং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবল ভাবেই রয়ে গেছে। তাই মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনে যা প্রয়োগ করছে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না। বিপত্তিটা এখানেই, প্রকৃতির মধ্যে যে বিজ্ঞান রয়েছে, মানুষ তার স্বরূপ জানতে বা প্রকৃত মূল্য বুঝতে আগ্রহ করছে না। মানুষ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃতির দিকে না তাকিয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কার গুলিকে ব্যবহার করে যাচ্ছে এবং অতি দুঃখের বিষয় মানুষের মনের বিকাশ বিজ্ঞানের আবিষ্কার গুলির সঙ্গে তাল ও মাত্রা রেখে এগিয়ে যাচ্ছে না। পুরোনো ধ্যান ধারণা, অলীক অন্ধসংস্কার, যুক্তির মাধ্যমে নতুন কিছু গ্রহণ করার ক্ষমতাকে দমিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নিত্যনতুন প্রয়োগ লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই যে কোন আবেগের বশবর্তী হয়ে মানুষ যুদ্ধ নামক ধ্বংসের খেলায় যে কোন সময় লিপ্ত হয়ে যায়। রাষ্ট্রশক্তি তার সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষের আবেগকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে অন্ধ-উগ্রজাতীয়তাবাদ ও তার ফলস্বরূপ পারমাণবিক বোমার ধ্বংসলীলা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে যে কথাটি বুঝতে হবে তা হল, বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় লক্ষাধিক পারমাণবিক বোমা মজুদ রয়েছে যাদের কোনটাই লিটল বয় থেকে কম শক্তিধর নয়। তাই আজ মানবসভ্যতা এক চরম বিপদের সম্মুখীন।

মানব সভ্যতার ঊষাকালে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল প্রায় শূন্য, কিন্তু জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ছিল অদম্য, কল্পনা শক্তি ছিল অসাধারণ, তাই প্রকৃতির সকল রহস্যের উত্তর যখন সমাজের শীর্ষে স্থানীয়রা নানামনজ্ঞ কাহিনীর মাধ্যমে দিত, অন্যরা ধ্রুবসত্য হিসাবে তা গ্রহণ করত। ঐ সময়েই সমাজের নির্দিষ্টরূপ, আচার-বিচার ও প্রাচীন ধর্মগুলির সূচনা হয়। তাই সবধর্মগুলির মধ্যেই দেখা যায় সৃষ্টি রহস্য ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে অসাধারণ সব অলীক কাহিনী। কিন্তু সভ্যতার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির প্রকৃত রূপ যখন মানুষের সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে শুরু হল তখন এই রূপ কথার জগৎ থেকে মানস সভ্যতার উত্তর হওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। এর অনেক কারণের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ হল কিছু বুদ্ধিমান লোক তা ঘটতে দেয়নি।

প্রকৃতির মধ্যে যে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সত্য রয়েছে তা হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সামঞ্জস্যবিধান করা। যেমন বাঘ হরিণ মারে, কিন্তু সব হরিণ

একসাথে মারে না। তার আহার সংগ্রহের জন্য যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই মারে, নিজের খাদ্যশৃঙ্খল অটুট রাখে। প্রাণীরা স্ট্র্যাগল করে কিন্তু যুদ্ধ করে না। তারা নিজ এলাকা সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু যুদ্ধ করে না। কিন্তু মানুষ দলবেঁধে প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করে নিজ প্রজাতির মধ্যে আত্মঘাতি সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যুদ্ধের মাধ্যমে কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়নি এবং সমস্যা আরো বেড়েছে। কিন্তু মানুষ তার অজ্ঞতার জন্য এই চরম সত্যটি বুঝতে পারে না। মানবসভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, রাষ্ট্রনায়ক থেকে বিজ্ঞানকর্মী ও সাধারণ জনগণ সকলকে বৈজ্ঞানিক চেতনায় সমৃদ্ধ হতে হবে। যুদ্ধ নয় হানাহানি নয় বরং শান্তির জন্য শুধু রাষ্ট্র নয় আন্তর্জাতিক স্তরেও চেলেঞ্জ রয়েছে।

এই চেলেঞ্জ গুলি হল :-

১) পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।
২) অরণ্য নিধন প্রতিরোধ।
৩) ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ।
৪) সকলের জন্য পরিস্রুত জল সরবরাহ।
৫) উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে শক্তির সাশ্রয়।
৬) অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদন।
৭) সকলের জন্য বাসস্থান।
৮) অপুষ্টি দূরীকরণ।
৯) গ্রীন হাউস এফেক্ট নিয়ন্ত্রণ।
১০) ওজোন গহ্বর নিয়ন্ত্রণ।
১১) অ্যাসিড বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ।
১২) সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা।
১৩) সকলের জন্য শিক্ষা।

এই চেলেঞ্জ গুলি মোকাবিলা করতে হবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। আমরা জানি বা না জানি চাই বা না চাই বিজ্ঞানই আমাদেরকে স্বার্থক ভাবে ধারণ করে রেখেছে তার অসাধারণ নিয়মনীতির মাধ্যমে। তাই বিজ্ঞানই আমাদের ধর্ম হওয়া উচিৎ। শুধু মানুষের কেন, বিজ্ঞান হল সকল জীবের ধর্ম, নিখিল বিশ্বের ধর্ম, এই ধর্মের সাধনাই আনবে শান্তি – গড়বে সভ্যতা।

জলই জীবন

▣ গৌতম ভট্টাচার্য্য

জীবনের আরেক নাম জল। হ্যাঁ, সত্যি জল ছাড়া জীবন নেই। কোটি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে যখন জীবনের অস্তিত্ব ছিল না, যখন পৃথিবীতে শুধু জল আর জলই ছিল, তখন ঐ জলের মধ্যে চলতে লাগল হাজারো বিক্রিয়া আর সেই বিক্রিয়ার ফলস্বরূপ তৈরী হল নানা জৈব পদার্থ যার থেকেই আদিম কোষ তৈরী হতে শুরু হল। তারপর জৈব বিবর্তনের হাত ধরে এই সুন্দর পৃথিবী ভরে গেল নানা প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদকূল। ধীরে ধীরে এল মানুষ নামের এক বিশেষ প্রাণী।

তাই জল ছাড়া এই জীবন কখনো সম্ভব না। আজকাল আমরা জানতে পেরেছি যে এই পৃথিবীর মাটির নিচের জল শেষ হয়ে যাচ্ছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ নানা কারণে এবং তার মধ্যে এই মানব জাতি নামে যে প্রাণীটি এই পৃথিবীকে চষে বেড়াচ্ছে, তাঁর অবদান এই শেষ হয়ে থাকার পেছনে অনেক অংশে দায়ী। আমাদের পৃথিবীতে এখন জনসংখ্যা বেড়েই চলছে যার ফলে মাটি সংকুচিত হচ্ছে, বাড়ছে পানীয় জলের চাহিদা। আর এই চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ মাটির নিচের জলকে নিশেষ করে ফেলছে। অতিরিক্ত মাত্রায় মাটির নিচের জল ব্যবহার হচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি পানীয় জলের কোম্পানীর দৌলতে। এর মধ্যে অনেক বহুজাতিক কোম্পানীরা চাইছে আমাদের দেশের বা দক্ষিণ পূর্ব গরীব দেশগুলো থেকে যতটা সম্ভব মাটির জল শুষে নিতে। তাই বিজ্ঞানীরা বলছেন যে হয়তো এমন একটা দিন আসবে যখন মানুষ মাটির নিচের জলের জন্য লড়াই করচে, তেলের জন্য না। যাইহোক যে ব্যাপারটা নিয়ে বলতে চাইছি যে আমরা যদি এখনও না সচেতন হই তাহলে আগামী ২০৫০ এর ভেতরে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ জলের জন্য হবেই এবং প্রচুর মানুষের প্রাণ এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। একটা চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবেই, এর থেকে কোন রক্ষা নেই।

আমাদের দেশে প্রায় ছয় মিলিয়ন লোক আছে যারা ঠিক ভাবে ব্যবহার যোগ্য জল পায় না। এই অবস্থা দিন কে দিন আরো খারাপ হচ্ছে। আমাদের দেশে আরো একটা বিচিত্র চিত্র ফুটে উঠে। দেখা যায় কোন কোন অঞ্চলে পানীয় জলের জন্য মা, বোনেরা প্রায় ৪-৫ কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে কুঁয়ো থেকে বা নদী থেকে বা ঝরণা থেকে জল সংগ্রহ করে, আবার তার উল্টদিকে দেখা যায় শহর অঞ্চলে অফুরন্ত জল অপচয় হচ্ছে নানা ভাবে। বাড়ীঘরে যথেচ্ছ ভাবে জল

ব্যবহার করা হচ্ছে, অপচয় হচ্ছে রাস্তাঘাটের জলের কল খোলা রেখে বা জলের কলের মুখ-কে চুরি করে নিয়ে গিয়ে। এই সব জল কোথা থেকে আসে ? এই সব জল সাধারণত শহরাঞ্চলের মাটির নিচের থেকে আসে বা নিকটবর্তী কোন নদী থেকে আসে। এই জল অপচয় হবার পেছনে অনেক কারণ আছে তার মধ্যে সরকারের যেমন গাফিলতি আছে, আমরা সাধারণ মানুষ ও দায়ী। সরকারী দোষ ত্রুটি যদি বিচার করি তাহলে প্রথমেই বলতে হবে অনেক রাজ্য সরকার আছেন যারা সঠিক ভাবে জল সরবরাহ করার কোন নীতি করে নি। তারপর আছে জল সরবরাহ করার সংস্থানদের অপকর্ম। এরা ভাল জলের পাইপ ব্যবহার করবে না, ঠিক ভাবে কাজ করবে না কম দামের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে ইত্যাদি। আর সাধারণ মানুষের দোষ যদি বিচার করা যায় প্রথমে বলতে হবে যে এরা অন্ধ বা বোবা বা বোকা বনে থাকতে পছন্দ করে। এরা সরকারের অপকর্ম নিয়ে কথা বলে না। এরা নিজেদের বাড়ীতে জলের ব্যবহার সঠিকভাবে করার পদ্ধতি জানে না। দেখা যায় রাস্তাতে যদি জলের কলটা খোলা থাকে তা বন্ধ করার কোন উদ্যোগ নেয় না। তাই আমাদের এই ধরনের বিষয়ে ভাবতে হবে, নিজেদের চরিত্র বা চিন্তাধারা পাল্টাতে হবেই না হলে আমাদের আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। তাই আসুন আমরা কিছু করি যাতে জলের অপচয় রোধ করা যায়। প্রথমতঃ আমাদের এখন সবচেয়ে বড় যে কাজ, সেটা হল মাটির নিচের জলের উৎসকে বৃদ্ধি করা। সেটা কি করে করব ? এটা সত্যি কথা কি এটা জলের মতো সোজা। মাটির নিচের জলের উৎসকে বৃদ্ধি করতে হলে বৃষ্টির জলকে ধরতে হবে। যাকে 'রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং' বলে। এই পদ্ধতি খুবই সোজা। আমরা যদি আমাদের ঘরের ছাদের জলকে মাটির নিচে প্রবেশ করানোর উদ্যোগ নিতে পারি পাইপ দিয়ে তাহলেই হয়ে গেল। এই জল ইচ্ছে করলে আমরা আমাদের শৌচালয়েও ব্যবহার করতে পারি। এরপর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যেতে পারে। সেটা হল আমাদের জলের উৎস যেমন ঝরণা, বড় বড় জলাশয়, দীঘি বা পুকুর এগুলোকে সংরক্ষিত করতে পারি। এখনকার দিনে নানা জমি মাফিয়ারা অবৈধভাবে পুকুর বা জলাশয়কে দখল করে তা ভরাট করে বড় বড় ফ্ল্যাট তৈরী করছে। এগুলো আমাদের রুখতে হবে। তা না হলে মাটির নিচের জল সংরক্ষিত থাকবে না।

এর পর আসা যাক ওয়াটার শেড তৈরী করার কথা। ওয়াটার শেড এমন একটা পদ্ধতি যেখানে মাটির মধ্যে শ্রম দিয়ে জলের উৎস তৈরী করা। ওয়াটার শেড ইচ্ছে করলে একটি ক্ষেতের মাঝেও করা যেতে পারে বা কোন পাহাড়ের গায়ে বা পাদদেশে তৈরী করা যেতে পারে। ওয়াটার শেড তৈরী করার সাথে

সাথে ঐ ওয়াটার শেডের চারপাশে নানারকমের গাছ লাগাতে হবে যাতে ঐ জায়গাটাতে একটা ছায়া তৈরী হয় এবং ঠান্ডা থাকে। এই ধরনের উদ্যোগ ব্যাপক ভাবে নিতেই হবে। তা না হলে কোন লাভ নেই।

সবশেষে যা বলব তা হল আরো সচেতনতা চাই এবং এই সচেতনতার জন্য চাই শিক্ষা - পুঁথিগত না ব্যবহারিক শিক্ষা। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বলা উচিত যেন ওরা রাস্তার জলের কল খোলা না থাকে তার জন্য দল বেঁধে নজর রাখে। ওদেরকে বলতে হবে এবং বোঝাতে হবে আজকের পৃথিবীতে কেন জলের সংকট এবং এর জন্য কে দায়ী ? যদি আমরা ঐভাবে এগুতে পারি তবে হয়তো এই পৃথিবীর জলের সংকট কিছুটা হলে সমাধান হবে।

আসুন আমরা সবাই মিলে বলি–

“জলই জীবন, জীবনই জল
রেখো না খুলে জলের কল
চলার পথে যদি দেখা হয়,
খোলা জলের সাথে
বন্ধ কর যদি ঐ কল
ভাল ফল পাবে ভবিষ্যতে।”

AGRIALLIS

Science for Agriculture and Allied Sector: A Monthly e Newsletter

A National Level Peer Reviewed e Magazine

on

Agriculture and Allied Sciences.

AN INITIATIVE BY

GROWING SEED

www.agriallis.com

Save Water, Save Life !

We are **Running** out of **Water**

THE LOOMING CRISIS & SOLUTIONS TO
CONSERVE OUR MOST PRECIOUS RESOURCE

Growing SEED

Dharmanagar, Tripura North
Pin : 799250